বঙ্গ কমলবার্তা

জুলাই সংখ্যা। ২০২৫

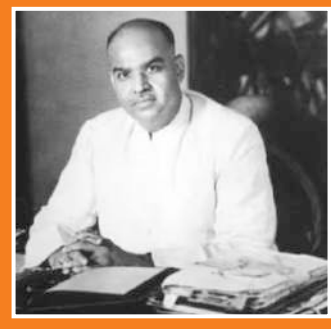

শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

তৃণমূলকে পরপারে পাঠানোর ডাক দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ব্রাজিলে রিও ডি জেনেইরোতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সাথে এক ফ্রেমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা-র উষ্ণ অভ্যর্থনা।

আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস-এ মহাত্মা গান্ধী প্রতি শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জুলাই সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

পরপারে তৃনমূলঃ ডাক দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৬
জয়ন্ত গুহ

তৃণমূলের ধর্ষণ সংস্কৃতির বলি বাংলার মেয়েরা ৯
স্বাতী সেনাপতি

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনঃ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য এক নতুন দিশা ১১
সৌভিক দত্ত

ডিএ নিয়ে ফেঁসে গেছে কালীরামের ঢোল ১৪
অভিরূপ ঘোষ

ছবিতে খবর ১৬

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিস্মৃত নদিয়ার 'পন্ডিত' ২৬
রণদৃপ্ত শীল

হরিপদ ভারতী থেকে শমীক ভট্টাচার্য ২৯
বিনয়ভূষণ দাশ

ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ৩২
রাজাগোপাল ধর চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

বাঙালি এমনিতেই বেড়াতে ভালবাসে। আর পুজোর ছুটিতে তো বেড়াতে যাবেই। অনেকেই ইতিমধ্যে পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন। দিল্লি, মুম্বই, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তপ্রদেশ, গুজরাটের টিকিটও কেটে ফেলেছেন অনেকে। যারা বেশী দূরে যেতে পারবেন না, তাঁরা হয়তো ভেবে রেখেছেন আসাম বা উড়িষ্যায় যাবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি। দিঘা ছাড়া কোনও গতি নেই।

কেননা আপনি তো বাঙালি। বাংলায় কথা বলেন। বাইরে বেড়াতে গিয়ে হয়ত মুখ ফসকে বাংলা বেরিয়ে গেল। ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে প্যা পোঁ, প্যা পোঁ করে পুলিশের ভ্যান। আপনাকে পুলিশ এসে ঘ্যাক করে ধরল। সোজা আপনাকে ঢুকিয়ে দিল থানায় বা ডিটেনশন সেন্টারে। কোনও কথা হবেনা। কেননা আপনি বাংলায় কথা বলেছেন। আপনি বাংলাদেশী।

আপনি যতই বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন, আপনি বাংলাদেশী নন। আপনি আলু পোস্ত, রসগোল্লা ভালবাসেন। শেষ চেষ্টায় আপনি হয়ত জোর দিয়ে বললেন, সত্যি বলছি আমি বাংলাদেশী নই। মা কালীর দিব্যি বলছি- কিন্তু না কোনও কাজ হবেনা তাতে। বাংলায় কেন কথা বলেছেন আপনি?

এ তো অদ্ভুত কেস ভাই। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশী? আরে সেই কথাটাই তো বলছেন, দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানো তৃণমূল সাংসদ। তিনি তো এর বিরুদ্ধে 'গজ্জে' উঠতে বলেছেন। আর সেই 'তিনি', যার নামে পশ্চিমবঙ্গে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তিনি তো বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বলেছেন, "লজ্জা করে না! আমার তো লজ্জিত মনে হয়। বাংলা ভাষায় কথা বললেই পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলার শ্রমিকদের"। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কোন বাঙালী তাঁর এই অলীক তত্ত্বে বিশ্বাস করবে তা তিনি এবং তেনারাই জানেন। আরে বাবা, মিথ্যা বলাটার মধ্যেও একটা স্মার্টনেস থাকা দরকার। এই 'বাংলা বললেই বাংলাদেশী'-র জুজুর গল্পে সেটাও নেই। তবে একটা বিষয় প্রবলভাবে আছে। সেটা হচ্ছে রহস্যময় এক অনীহা। পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করা এবং সীমানার ওপারে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের ছেড়ে দিয়ে আসার অনীহা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে তথ্য অনুযায়ী, গোটা দেশে যত বেআইনি বাংলাদেশী আছে তার সিংহভাগের ঠিকানা এই পশ্চিমবঙ্গে এবং এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে যত অবৈধ বাংলাদেশী ধরা পড়েছে তার ৯০ ভাগ এই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে জাল নথিপত্র তৈরি করে।

ভাল থাকুন সবাই। নির্ভয়ে বেড়াতে যান। বাংলায় কথা বলুন। গর্বের সঙ্গে বলুন। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসন খুব ভাল করে জানে কারা অবৈধ বাংলাদেশী, আর কারা ভারতের নাগরিক।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

“ব্যাঙ্গালোরের এক হোস্টেল থেকে ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি পুলিশ গ্রেফতার করে সেসময়ের তুখোড় বিরোধী রাজনীতিক অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। তার আগের দিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করে পুরো দেশকে এক চরম সংকটে ঠেলে দেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন জনসংঘের নেতা এবং আরএসএস-এর সদস্য। তাকে যখন থানায় আনা হয়, তখন বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছিল। তবে তিনি বেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে একমাস কারাগারে কাটাতে হয়। সেখানে বসে তিনি কবিতা লিখতেন। নিজেকে তিনি নাম দিয়েছিলেন কায়দি কাভিয়ারি- অর্থাৎ বন্দী কবি। সেখানে তিনি তাস খেলেও সময় কাটাতেন, আর রান্নাঘরে রান্নার তত্ত্বাবধান করতেন। ১৯৭৭-এ শেষ হয় জরুরী অবস্থা।

তবে সেসময় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি বিরোধী মোর্চা বা জনতা পার্টি গঠনে বড় ভূমিকা পালন করবেন বাজপেয়ী। ১৯৭৭ সালে মার্চের নির্বাচনে জনতা দল ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর সেই প্রথম কংগ্রেস ভারতের জাতীয় নির্বাচনে হারলো। নির্বাচনে জনতা পার্টি পার্লামেন্টের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জিতেছিল। জনসংঘ একাই জিতেছিল ৯০টি আসন, সবচেয়ে বেশি। জনতা পার্টি যখন তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাচ্ছিল, তখনই রাজনীতিতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে উত্থান ঘটছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন বেশ ক্যারিশম্যাটিক, ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন এবং জনতা পার্টির সভা-সমাবেশে তার কথা শুনতে আসতো অনেক মানুষ। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মূলধারার রাজনীতিতে পরিণত করতে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।”

“জীবনের যে কোনও অবস্থায় হাস্যরস ছিল বাজপেয়ীর নিরন্তর সঙ্গী। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার পর যখন তাঁকে ব্যাঙ্গালোর জেলে রাখা হয়, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপ্পা ঘাটাটে জেলে গিয়ে দেখেন বাজপেয়ী ডোরা কাটা জামা আর হাফ প্যান্ট পরে বসে আছেন নিজের সেলে। মরাঠি বন্ধু আপ্পা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধুতি পরলেই তো পারেন, এ রকম জামা-প্যান্ট পরার দরকার কী? জবাবে তিনি বলেন, আমি এখন ইন্দিরা গাঁধীর অতিথি। তিনি খাওয়াদাওয়ার ভার নিয়েছেন, বসনেরও। তা নিজের পয়সা খরচ করি কেন? এটাই অটল বিহারী বাজপেয়ী।

রাজনৈতিক সৌজন্যের যে বিরল চিত্র আজ ভারত দেখছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের মধ্যে, এর সূচনা আমরা দেখতে পাই শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে। ১৯৭৭ সালে বাজপেয়ী যখন প্রথম মোরারজি দেশাই সরকারের বিদেশমন্ত্রী হন, সে দিন সাউথ ব্লকে গিয়েই তিনি প্রথম প্রশ্ন করেন, এখানে নেহরুর একটি তৈলচিত্র ছিল, সেটি কোথায় গেল? খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, জনসঙ্ঘের সরকার এসেছে বলে কোনও এক আমলা নেহরুর ছবিটা সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত ভেবেছিলেন, বাজপেয়ী খুশি হবেন। কিন্তু বাস্তবে বিদেশমন্ত্রী হয়ে বাজপেয়ী প্রথম নির্দেশ জারি করেন, ওই ছবিটা ফিরিয়ে আনতে হবে। বাজপেয়ীর বক্তব্য ছিল, ইতিহাসকে কখনও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন না। এটা করা যায় না।”

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

ছাব্বিশে পরপারে তৃনমূল

ডাক দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য

জয়ন্ত গুহ

বিজেপি জিতছে। তৃণমূল হারছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পৃথিবীর কোনও শক্তি এবারে চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারবেনা- শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ।

অভিনন্দন সমারোহ অনুষ্ঠানে, এক্কেবারে সঠিক সময়ে রাজ্য সভাপতি ডাক দিলেন তৃণমূলকে পরপারে পাঠানোর। নিখুঁত টাইমিং-এ শচীন তেন্ডুলকরের মত একটা রাজকীয় ছক্কা বাংলার রাজনীতিতে। এবং ব্যক্তি আক্রমণে অযথা শক্তিক্ষয় না করে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করিয়ে দিলেন সিপিএম এবং কংগ্রেসকে। বলা ভাল হাতে পেনসিল ধরিয়ে দিলেন। এক ধাক্কায় দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে দিলেন ফিসফ্রাই জোট। এবার সিপিএম ও কংগ্রেসকে হয় তৃণমূলের সঙ্গে মিছিলে হাঁটতে হবে বিজেপি বিরোধিতায় কিংবা তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে জোট বেঁধে নামতে হবে রাস্তায়। হাতে পতাকা নয় থাকলো না। এমনটা যে হতে পারে তা আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এ রাজ্য দেখেছে। আর তা না করে, তৃণমূলের ভোট কাটুয়া হয়ে বিজেপির ভোট কেটে তৃণমূলকে আবারও ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিলে বাম-কংগ্রেসকে মানুষ ভোট দেবে কেন? তাঁদের তৃণমূল বিরোধিতার ভোট নিয়ে বাম-কংগ্রেস আসলে তো সুবিধা করে দিচ্ছে তৃণমূলকেই।

অভিনন্দন সমারোহ মঞ্চে তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য

“ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ পরিত্রান চায়। বাংলা বাঁচতে চায়, বাংলা দুর্নীতি বন্ধ করতে চায়। বাংলা সঙ্ঘর্ষ মুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রের প্রাঙ্গন দেখতে চায়। আজকে তার জন্যেই শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বিজেপির প্রয়োজন আছে।

মানুষ দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিআই (এম)-কে শুধুমাত্র ব্যালটের মধ্যে দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। গনতন্ত্রে শেষ কথা বলবে মানুষ আর এবারের নির্বাচন দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিল্পায়নের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন মেধার মর্যাদা দেওয়ার নির্বাচন। এবারের নির্বাচন বাংলা-বাঙালীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নকে, নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে, নরেন্দ্র মোদীর আবেগকে

বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার নির্বাচন। তাই শ্যামাপ্রসাদের বাংলা, আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষের বাংলা, হরিপদ ভারতীর বাংলা, সুকুমার ব্যানার্জি-তপন শিকদারদের বাংলা···আজ এই বাংলায় কথা বলবার যে অধিকার আমরা পেয়েছি···যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের সম্মান জানানোর নির্বাচন।

সমস্ত সিপিএম-এর ভাইবন্ধু শুনুন। সমস্ত বামপন্থী, সমস্ত কংগ্রেসিদের উদ্দেশ্যে বলছি। ভোট কাটা-র রাস্তায় গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনবেন না। সরাসরি রাস্তায় নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিছিল করুন। আমরা লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত আছি। 'নো ভোট টু বিজেপি'-র আড়ালে চক্রান্ত তৈরি করবেন না। বিজেপি কারও দয়ায় এই জায়গায় পৌঁছয় নি। ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের রাজনৈতিক উত্থান দেশের মানুষকে দেখিয়েছি। তাই যার যার পতাকা আছে ওই পতাকাগুলো কিছুদিনের জন্য একটু আলমারির ওপর তুলে রাখুন। পথে নামুন। তৃণমূলকে সরান। তৃণমূলকে বিসর্জন দিন। ২০২৬-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন।

তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দিকে·····শ্রীমতী গান্ধী, বাংলাদেশের জন্মদাত্রী ছিলেন। আজকে তাঁর কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তার ওপর রোজ থুতু ফেলছে। আর তাঁর নামাঙ্কিত লাইব্রেরির ৭০,০০০ বইতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এ দেখবার পরও যদি কারও শরীরে রক্ত গরম না হয় সে নির্বীর্য, সে ক্লীব। উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে আসুন। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মহিলা নেত্রী ছিলেন। আমাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই অমর্যাদা, এই অপমান বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। তাই এগিয়ে আসুন, সমস্ত মতপথ ভুলে এগিয়ে আসুন। তৃণমূলকে সরিয়ে দিন। তারপর যে যার পথ খুঁজে নেবেন। যে যার পতাকা তুলে নেবেন হাতে। অটোমেটিক্যালি তৈরি হবে বিরোধীদের জন্য অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি স্পেস, সেটাকে ভরাট করবেন।”

রাজ্য সভাপতির এই ডাকে বাম ও কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা যদি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যদি মনে করে, অনেক হয়েছে। আর

নয়। নামব পথে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদি মনে করে আমার শিরদাঁড়া আমি কোনও কমিটির কাছে-ভয়ের কাছে-আপসের কাছে আর বন্ধক রাখব না। আমার শিরদাঁড়া আর বোধ বুদ্ধিকে আমি ব্যবহার করব আমার সন্তানের সুরক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য, রাজ্যের মেধা সুরক্ষা ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, রাজ্যের অর্থনীতি-শিল্প-কৃষির উন্নয়নের জন্য, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন আসবে, ক্ষমতায় এলে বিজেপি কি দেবে আমাদের? আর অধিকার থাকা সত্ত্বেও কিইবা আমরা পাইনি এবং পাচ্ছিনা বাম-তৃণমূলের শাসনকালে?

বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে বিজেপি বদ্ধপরিকর – রাজ্য সভাপতি, শমীক ভট্টাচার্য

“একটা দল একটা সমাজকে বাজার বানিয়ে দিয়েছে, যেখানে আলু-পটলের মত চাকরি বিক্রি হচ্ছে, মেধা প্রতারিত হচ্ছে। সেই বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আজ বিজেপি বদ্ধপরিকর।

আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। পশ্চিমবঙ্গে কোনও মেধা ভবিষ্যতে প্রতারিত হবেনা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভবিষ্যতে কোনও পরিযায়ী শ্রমিক আর অন্য কোনও প্রদেশে যাবেনা। সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য আজ বিজেপি বদ্ধপরিকর।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আগে আমাদের (পশ্চিমবঙ্গ) কন্ট্রিবিউশন ছিল, দেশের বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনে ৪০ শতাংশ। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় কমে দাঁড়িয়েছিল ৩০ শতাংশে। আর আজকে পশ্চিমবঙ্গের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে মাত্র ৮ শতাংশ।

সারা দেশের কৃষির উৎপাদনে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ৩.৩ শতাংশ। যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় চাল উৎপাদনে দেশের মধ্যে ১ নম্বরে ছিল, আজ আমরা ৩ নম্বর জায়গায় চলে এসেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রান্ত নীতির কারণে আলু চাষিরা আত্মহত্যা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের আলু ব্যবসায়ী, আলু চাষিদের সর্বনাশ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের এই আত্মহত্যার জন্য কোনও আন্দোলন তৈরি করতে পারেনি সিপিএম। ব্যর্থ কৃষক সভা।

শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের তরুন-তরুনী আজ আইটি (ইনফরমেশন টেকনোলজি) কুলি। ১৮,০০০ টাকা মাইনের আইটি মজদুর। আর

যারা লেখাপড়া কম জানেন তাঁরা আজ ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিক। তারাও মজদুর। এই মজদুরের পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরাতে হবে। বাংলার মাটিতে যে শিল্প সম্ভাবনা আছে, বিনিয়োগের যে চরম সুযোগ আছে, বাংলার যে ভূ-প্রাকৃতিক সুবিধা আছে, বাংলার যে বন্দরের সুবিধা আছে, যে মেধা আছে, যে অর্থ আছে- সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তার সম্পূর্ন বিকাশের প্রয়োজন।

সোনার বাংলা ছিল, সোনার বাংলা বানাতে হবে। শুধু স্লোগানে নয়, এ রাজ্যে বিনিয়োগ এনে, শিল্পে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এনে, এসইজেড এনে, পণ্যের গুণমান এনে, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার মানুষ যাতে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে পারে, গুজরাটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, পাল্লা দিতে পারে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। পাল্লা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই, তাদের পিছনের সারিতে বসতে চাইনা।

আর সেই বাংলা গঠনের লক্ষ্যেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিচ্ছেন দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষের কাছে, বিজেপির প্রতিটি কার্যকর্তার কাছে, বাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে। সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা ঢাকতে তৃণমূল ও তাদের দোসর সিপিএম রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিথ্যা বিভাজন তৈরি করেছে ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে। বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক দল বলে তকমা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র তা নয়। খুব পরিষ্কার ভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

বিজেপির লড়াই সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে নয়

বিজেপির লড়াই কোনও মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। হ্যাঁ, আমরা লড়াই করছি আপনাদের বিরুদ্ধে কারণ আপনাদের বাড়ির ছেলেরা যারা হাতে পাথর নিয়ে ঘুরছে, আমরা ওই পাথরটাকে কেড়ে নিয়ে হাতে বই ধরিয়ে দিতে চাই। যারা তলোয়ার নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, আমরা ওই তলোয়ার কেড়ে নিয়ে তাদের হাতে কলম ধরিয়ে দিতে চাই। এই লড়াই বিজেপির লড়াই, এটা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করে দেখাবে।

তৃণমূল নিজের দলের, সরকারের দুর্নীতিকে ঢাকতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের আজ ভাবার সময় এসেছে, আপনি যদি নিজেকে একজন ভারতীয় নাগরিক বলতে গর্ব বোধ করেন তাহলে ভেবে দেখুন একবার, কেন আপনার সন্তান শুধু খুনোখুনি করবে? কেন আপনার সন্তান গরীব হয়ে থাকবে? ভেবে দেখুন একবার, আপনি এ রাজ্যে কোন অবস্থায় আছেন আর একজন মুসলমান গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে কোন অবস্থায় আছে? এ রাজ্যের উন্নয়ন হলে আপনার ক্ষতি না লাভ হবে? কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্প যা এ রাজ্যে চালাতে দিচ্ছেনা মমতা সরকার, তাতে তো আপনারও ক্ষতি হচ্ছে। তৃণমূলের 'ভয়ঙ্কর খেলা' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

ছাব্বিশের লড়াই অস্তিত্বের লড়াই। তৃণমূলকে পরপারে পাঠানোর লড়াই

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর চেহারা বদলে গেছে। আজকে আসামের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখুন, ত্রিপুরা দেখুন, ঝাড়খণ্ড দেখুন- আর পশ্চিমবঙ্গকে দেখুন। কেন্দ্রের কোনও পরিকল্পনা এখানে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। পিএম জনধন প্রকল্প, পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম শ্রী- পশ্চিমবঙ্গে নেই। পিএম সূর্যঘর পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছেন না ··· একটার পর একটা কেন্দ্রের প্রকল্পের নাম বদল করা থেকে ক্ষান্ত হয়নি। তাঁদের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক লুঠের কারণে বঞ্চিত হয়ে গেছে বাংলা। আজকে সেই জায়গা থেকে আমাদের এই রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বিজেপি জিতছে। তৃণমূল হারছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পৃথিবীর কোনও শক্তি এবারে চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারবেনা।

তৃণমূলের ধর্ষণ সংস্কৃতির বলি বাংলার মেয়েরা

স্বাতী সেনাপতি

বয়স ৭ হোক বা ৭০ - মেয়ে হলে এই রাজ্যে ছাড় নেই কারও। বিপদ এখন শুধু তৃণমূলের পার্টি অফিস, তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে, অন্ধকার গলির কোণ, রাস্তাঘাটে লুকিয়ে নেই, বিপদ এখন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালেও লুকিয়ে আছে। তাই তৃণমূল নামক আগাছাকে উৎখাত না করতে পারলে আপনার, আমার বাড়ির সন্তান, মা-বোনেরা রক্ষা পাবে না।

"পিঠে পিঠে করে বউ,
পিঠে খায়নি আমার বউ"

বাংলায় একটি কথা খুব প্রচলিত আছে। যদিও মোমো, পিৎজার যুগে পিঠে খাওয়ার চল-টা প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। তবু বছর খানেক আগে মিডিয়ার দৌলতে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছিল পিঠে! নেপথ্যে ছিল সন্দেশখালি। বাংলার মানুষ জানতে পেরেছিলেন মডেল সন্দেশখালির ভয়াবহ সব ঘটনা। সন্দেশখালির ত্রাস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্টু ছেলে শেখ শাহজাহান এবং তার লুম্পেন বাহিনীর মহিলাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী জেনে শিউরে উঠেছিল মানুষ। বাড়ির মহিলাদের রাতবিরেতে পিঠে বানাতে ডেকে নিয়ে যাওয়া, নানা উপায়ে মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করার ঘটনা সামনে এসেছে। বাংলার মানুষ দেখেছে কি নির্লজ্জভাবে পুলিশ নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল শাহজাহানকে। তারপর অবশেষে হাইকোর্টের কানমলা খেয়ে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতারির নাটকও দেখেছে মানুষ। দেখেছে, আর ভেবেছে দূরে দূরে গ্রামে গঞ্জে তো কতকিছুই হয় এমন। কিন্তু বিপদ যদি শুধু গ্রামেগঞ্জে না হয়ে আপনার ড্রয়িংরুম পর্যন্ত চলে আসে? তখন?

সন্দেশখালির পর বাংলার মানুষ দেখল আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ড। ৩৬ ঘন্টা ডিউটি করার পর হাসপাতালেই নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম নিতে গেছিল অভয়া। তাকে ধর্ষণ করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি তৃণমূল আশ্রিত ধর্ষকরা। সমগ্র বিশ্ব উত্তাল হয়ে উঠল সেই ঘটনায়। বাংলার মানুষ আবারও দেখল ধর্ষকদের বাঁচাতে সরকারের মরিয়া প্রচেষ্টা! এখনও সেই ঘটনার এক বছর কাটেনি তার আগে আবারও একটি গণধর্ষণের ঘটনা। গ্রামাঞ্চল, শহরের নামকরা সরকারি হাসপাতালের পর এবার সরকারি আইন কলেজ। কসবায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রী গণধর্ষিতা হল। যেখান থেকে পাশ করে পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে কেউ আইনজীবী, কেউ বিচারক হন, দেশের আইনি পরিকাঠামো, নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেন। সেই কলেজে গণধর্ষিতা হলেন তৃণমূল সমর্থক এক ছাত্রী। ধর্ষিতা হল তৃণমূলেরই নেতা মনজিৎ মিশ্র এবং তার দুই চ্যালার হাতে! মেয়েটির এফআইআরের বর্ণনা পড়লে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। মনজিতের গ্রেফতারির পর শুধু এই মেয়েটিই নয়, আরও অসংখ্য কীর্তি সামনে আসছে। শুধু এই একটি কলেজ নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সরকারি কলেজের ইউনিয়ন রুমগুলো তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠছে। কলেজগুলিতে তাদের প্রবেশ অবাধ। ইউনিয়ন রুমগুলোতে মদ, গাঁজা অন্যান্য ড্রাগের রমরমা চলে। সন্ধ্যে হলেই বসে যায় মদের আসর। তোলাবাজি, কলেজে জুলুমবাজি, ছাত্র ভর্তি করানোর নামে টাকা তোলা, মহিলাদের হেনস্থা করা নিত্য দিনের

অঙ্গ। কলেজে ঢুকতে এদের কোনও পরিচয়পত্র লাগে না। তারা তৃণমূলের নেতা, এটাই যথেষ্ট। আসতে যেতে কলেজের রক্ষীরা সেলাম ঠোকে তাদের। কলেজের অধ্যক্ষও ভয়ে থরহরি কম্পা! চোখের ইশারায় যে কোনও মেয়েকে শিক্ষকদের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। শিক্ষকরাও মুখে কুলুপ দিয়ে নিজের চাকরি বাঁচাতে ব্যস্ত থাকেন!

আর ঠিক এখানেই প্রশ্ন ওঠে এত সাহস এরা পাচ্ছে কোথা থেকে? কে যোগাচ্ছে এই লুম্পেনদের সাহস। প্রশ্নটা যেমন সহজ, উত্তরটাও ততটাই সোজা।

নির্যাতিতা মেয়েটির এফআইআর কপিতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, মনজিৎ তাতে হুমকি দিয়েছিল যদি সে এই ধর্ষণের ব্যাপারে কারও কাছে মুখ খোলে তাহলে তার বয়ফ্রেন্ডকে খুন করে দেওয়া হবে! সে যদি পুলিশের দ্বারস্থ হয় তাহলে তার বাবা মাকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে! হুমকিতে যদি কাজ না হয় তাই ধর্ষণ করার ভিডিও তুলে রাখা যায় যাতে ভবিষ্যতে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। শুধু এই একটি মেয়েই নয়, এর আগেও একাধিক পড়ুয়াকে একই কায়দায় ধর্ষণ করেছে সে। ২০১৩ সাল থেকে একাধিক মামলা রয়েছে তার নামে। পুলিশের খাতায় নাম থাকার পরেও ওই কলেজেই অস্থায়ী চাকরি পেতে কোনও অসুবিধা অবশ্য হয়নি মনজিতের। তার কারণ অনুপ্রেরণার হাত রয়েছে তার মাথায়। বজবজের তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের প্রশ্রয়ে, আশ্রয়ে এত বাড় বাড়ন্ত মনোজিতের। কলেজে তোলাবাজি থেকে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে সবার মাথার উপর ছড়ি ঘোরানো সবই হত অশোক দেবের মদতে। দোসর ওই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নয়না চ্যাটার্জি। যদিও মিডিয়া এবং বিরোধী দল বিজেপির দৌলতে এসব কুকীর্তি আর লুকোছাপা নেই। তবে শুধু এই একটি কলেজে নয়, রাজ্যের প্রতিটি কলেজের গভর্ণিং বডির মাথায় রয়েছে তৃণমূলের কোনও না কোনও নেতা মন্ত্রী, বিধায়ক বা সাংসদ। এক একজন নেতা তো

কসবা ল-কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদ করতে গেলে দলদাস পুলিশ গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে।

আবার একাধিক কলেজে তোলাবাজির দায়িত্বে রয়েছে। আপনার এলাকার কলেজগুলোতে খোঁজ নিলেই এর সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে! এটা তো গেল মাথার উপর অনুপ্রেরণার হাত থাকার গল্পটা। কিন্তু কসবা গণধর্ষণের পর থেকে তৃণমূল নেতানেত্রীদের একের পর এক যে ধরণের বয়ান এসেছে তাতে এটা বলাই যায় তৃণমূলের চরিত্রের তিনটি দিক রয়েছে-

১. ধর্ষণ করা।

২. ধর্ষণে সাহায্য করা।

৩. ধর্ষণ হলে সেটি ধামাচাপা দেওয়া।

আর সেই কারণেই সব দুষ্কৃতী, ধর্ষক, লুম্পেনরা তৃণমূল নামক বিষবৃক্ষের আশ্রয়ে থাকতে চায়। তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা-সাংসদ-আইনজীবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে ধর্ষণ করে তাহলে সরকার কি করতে পারে! আবার মদন মিত্র বলছেন, কেন ওই মেয়েটি একা গেছিল ওই সময়? আবার অভিনেতা-তৃণমূল বিধায়ক বলছেন কলেজ ক্যাম্পাসে এত মেয়ে থাকতে কেন ওই মেয়েটিকেই টার্গেট করা হল?

সব বক্তব্য শুনতে শুনতে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে! সত্যিই তো ! কেন মেয়েটি পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে? তাহলে তো তাকে ধর্ষিতা হতেই হবে। কেন সে এই রাজ্যে মেয়ে হয়ে জন্মেছে! সত্যিই তো সে অনেক বড় অপরাধ করেছে। অবশ্য যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পার্কস্ট্রীট ধর্ষণ কাণ্ডে বলেন, ধর্ষণ সাজানো ঘটনা, যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ষণ ছোট ঘটনা, হাঁসখালির নাবালিকা ধর্ষণের পর খুন হলে বলেন, মেয়েটির লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল, সন্দেশখালিকে বলেন, তিল থেকে তাল করছে, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শরীর থাকলে যেমন জ্বর সর্দি হয় তেমন ধর্ষণও হয়। কখনও আবার দিদির প্রিয় ভাই কেষ্ট আইপিএস , আইএএসদের মা বোনদের কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেও দিব্যি ঘুরে বেড়ায়- সেই রাজ্যে ধর্ষকরা যে ধর্ষণ করতে সাহস পাবে আর ধর্ষণের পর তৃণমূল নেতাদের এই ধরণের সাফাই আসবে এ তো খুব স্বাভাবিক। ধর্ষণের মত এক ঘৃণ্য অপরাধকে এই রাজ্যের সংস্কৃতিতে পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস। বয়স ৭ হোক বা ৭০ - মেয়ে হলে এই রাজ্যে ছাড় নেই কারও। বিপদ এখন শুধু তৃণমূলের পার্টি অফিস, তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে, অন্ধকার গলির কোণ, রাস্তাঘাটে লুকিয়ে নেই, বিপদ এখন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালেও লুকিয়ে আছে। তাই তৃণমূল নামক আগাছাকে উৎখাত না করতে পারলে আপনার, আমার বাড়ির সন্তান, মা, বোনরা রক্ষা পাবে না। আরও অভয়ার অকালমৃত্যু ঘটবে, আরও কসবা হবে। কে বলতে পারে, এর পরের টার্গেট আপনার বাড়ির মেয়েটি নয়?

কালীগঞ্জ উপনির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য এক নতুন দিশা

সৌভিক দত্ত

কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন থেকে হিন্দুরা যেভাবে নিজেদের একত্রিত করা শুরু করেছে সেই প্রবণতা যদি জারি রাখে তাহলে ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে বাঙালি হিন্দুর জন্য একটি মরণ বাঁচন যুদ্ধ। হয়তো এই নির্বাচনই- ভবিষ্যতে আমাদের জাতির গতিপথ নির্ধারণ করে দেবে। আমরা আবার বঙ্কিমের সাধের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার নবজাগরিত জাতি হব নাকি পূর্ব-বাংলার হিন্দু কিংবা কাশ্মীরের হিন্দুদের মত একটি উদ্বাস্তু শরণার্থী জাতিতে পরিণত হবো। এ যেন আগামী ইতিহাসের জল বিভাজিকা। আর সেই মরণবাচন ফাইনাল ম্যাচেরই যেন নেট প্র্যাকটিস হয়ে গেল কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে। এটি নদিয়া জেলায় অবস্থিত কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনের ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি।

এই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিগত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ ঘোষের সঙ্গে জোর টক্কর হয় তৃণমূল প্রার্থী নাসিরউদ্দিন আহমেদের। ডেমোগ্রাফির হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই জয়ী হন নাসিরউদ্দিন। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৭০ বছর বয়সি এই বিধায়কের মৃত্যু হয়। ফলে তার মেয়ে আলিফা আহমেদকে কালীগঞ্জ থেকে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছিলেন বিজেপির আশীষ ঘোষ এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন আহমেদ।

না, এই উপনির্বাচনে বিজেপি জেতার আশা কখনোই করেনি। এইখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৫৭%! আর কে না জানে, মুসলিমদের কাছে বিজেপি হলো সাম্প্রদায়িক দল। যে দল তাদের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের জন্য নিষিদ্ধ পুজোর প্রসাদ পৌঁছে দিচ্ছে সেই দল তাদের আপন, আর তিন তালাক নিষিদ্ধ করে মুসলিম মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা - মুসলিমদের জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দূর্বলতা হল এটাই যে হিন্দুরা নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ভাবতে পারে না। এই ইদানীং বিজেপি বাংলার ময়দানে নামার আগে কোনো রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের জন্য কিছু করার কথা কোনদিন ভাবেনি কারণ হিন্দুরাই সেটা চায়নি।

করে মূলস্রোতে এগিয়ে নিয়ে আসা বিজেপি হলো তাদের শত্রু। কী আর করা যাবে। যারা যেমন ভাবে নিজেদের ভালো বোঝে। কিন্তু কথা হলো সাম্প্রদায়িক দল বিজেপিকে তারা ভোট দেবে না। আমি বলছি না, এই নির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত বুথগুলিতে বিজেপি প্রাপ্ত ভোটই সেই কথা বলছে। পরে আসছি সেই তথ্যে। তো, মোটের উপর কথা এই যে, ৫৭% শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভায় বিজেপি জেতার আশায় কখনোই ভোটে নামেনি। কিন্তু তাহলে লড়লো কেন বিজেপি?

যদি বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন দেখি সেখানেই ছিল প্রধান চমক। মুসলিম ৫৭% হলেও ওখানে হিন্দুও আছে ৪৩%! কিন্তু তৃণমূল বা বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মুসলিম সম্প্রদায় থেকেই এসেছে। যেহেতু হিন্দু জনসংখ্যা কম তাই হিন্দুদের অস্তিত্বের কোন গুরুত্বই এই তিন দলের কাছে নেই। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন একজন হিন্দু, আশীষ ঘোষ। এ যেন বাকি সবার কাছে রাজনৈতিকভাবে দমিত ও প্রতারিত একটি জাতির জন্য একমাত্র অবলম্বন হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা। কিংবা এ যেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই মেরুদন্ড সোজা রেখে বলা কথাগুলির বাস্তব প্রয়োগ- "এই মুহূর্তে, আমি মুসলিমদের ভোট চাই না!"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নদিয়া এলাকায় ঘোষদের দাপট সুপরিচিত। বাংলার অতি প্রাচীনকাল থেকেই যোদ্ধা জাতি হলো ঘোষরা। নদিয়া ও বর্ধমান জেলায় এখনো কিংবদন্তি হয়েছে সেখানকার রায়ঘোষ বংশের জমিদাররা। যারা দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়েছিলেন। এমনকি, আমি যেখানে থাকি সেই দত্তপুকুরেও যখন জনবসতি বসানো হচ্ছিল তখন দত্তপুকুরের সীমান্ত ঘিরে ঘোষদের জমি দিয়েছিলেন স্থানীয় জমিদাররা। কারণ, তাদের যোদ্ধা মনোবৃত্তি

ছিল কিংবদন্তি তুল্য। সেই প্রাচীন যোদ্ধা জাতি ঘোষদের থেকেই যখন কেউ লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে আসে তখন সেটা একটা আলাদা উদ্দীপনার বিষয় হয় বৈকি।

প্রার্থী তালিকা বের হওয়ার পরেই বিজেপির প্রার্থী দেখে বাংলার হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী শিবিরে সন্তুষ্টি ছিল তুঙ্গে। যে, ডেমোগ্রাফির চাপের কাছে বিজেপি নিজেদের বিলিয়ে দেয়নি। এই দলটাকে এখনো ভরসা করা যায়, যেমন এতদিন করে এসেছে। বাকি লড়াইটুকু ছিল হিন্দু ভোটকে একত্রিত করা। হিন্দুদেরও ভোটব্যাঙ্ক হতে শেখা ও ভোটের ময়দানে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ভাবতে শেখানো।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দূর্বলতা হল এটাই যে হিন্দুরা নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ভাবতে পারে না। এই ইদানীং বিজেপি বাংলার ময়দানে নামার আগে কোনো রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের জন্য কিছু করার কথা কোনদিন ভাবেনি কারণ হিন্দুরাই সেটা চায়নি। বাঙালি হিন্দুরা এতদিন ভোট দেওয়ার আগে মাও-মার্ক্স-লেনিন সহ আমেরিকার বিদেশনীতি-সোভিয়েত এর অর্থনীতি-ভিয়েতনাম এর রণনীতি-হিটলারের জাতিসত্ত্বা নীতি সহ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যাবতীয় বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তারপর ভোট দিতে গেলেও কোনোদিনও হিন্দুদের প্রাপ্য - নিজেদের চাহিদা - উদ্বাস্তু হিন্দুদের দুর্দশা - পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে পারেনি। তাই কোনো রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের নিয়ে ভাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। আর এসবের শুরু হয়েছিল সেই স্বাধীনতার '৪৭ সাল থেকেই। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য পূর্ণ পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, এই উদ্দেশ্যে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো, উন্নত এলাকায় কলোনী নির্মাণ ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা করলেও বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য কিছুই করেনি নেহেরু সরকার। কারণ আমরা চাইনি। তারা জানতো যে বাঙালি হিন্দুদের জন্য কিছু না করলেও ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি হিন্দুরা তাদের ভোট দেবে। আবার একই ভাবে যখন মাশুল সমীকরণ নীতিতে কলকাতা তথা বাঙালির অর্থনীতির সর্বনাশ করে দিল তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, তখনও আমরা তার কোন প্রতিবাদ করি নি। কারন আমরা কোনদিন নিজেদের ভালো চাইতেই শিখিনি। আমরা নিজেদের সম্প্রদায়গত ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ভাবতে শিখিনি। যে কারণেই বাঙালি হিন্দুদের আজ এত দুর্দশা। এই ঘুমন্ত অবস্থা থেকে আমাদের বেরোনোর প্রয়োজন। পাগলেও নাকি নিজের ভালো বোঝে কিন্তু আমরা বুঝিনা, দুর্ভাগ্য এটাই। হয়তো অপ্রাসঙ্গিক কিংবা নয়, তাও আরও একটি তথ্য দিয়ে রাখি।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন ইসলাম তোষণের কথা। খোলা মঞ্চে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তিনি ইসলামপ্রেমী! বললেন তার সব থেকে পছন্দের ধর্ম ইসলাম। তার বিধানসভায় প্রায় ৪০ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। তাদের সন্তুষ্ট করতে এভাবে খোলামেলাভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের অপমান করতে দুবারও ভাবেননি তিনি। এই রাজ্যে আমরা এতটাই দুর্বল হয়ে গেছি যে খোদ শাসকদলের একজন প্রতিনিধি খোলা মঞ্চে আমাদের অপছন্দ করার কথা জানাতে এক বারও দ্বিধাবোধ করেন না। এই ধরনের ঘটনা যদি আমাদের মেরুদণ্ডহীনতা না হয়, তাহলে মেরুদণ্ড না থাকা আর কাকে বলে?

যাইহোক, উপনির্বাচন তো হলো। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ট্র্যাডিশন মেনেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়নি। ২১ নম্বর বুথ থেকে কংগ্রেস এজেন্টকে বার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এসেছে। আবার, চাঁদঘর আদর্শ বিদ্যাপীঠের ৫৬ নম্বর বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি। আরোও টুকটাক কিছু সমস্যা ছিল। কিন্তু বিজেপি ছিল নিজের লক্ষ্যে অটুট। আর সেটা হল যত সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দুকে ভোট দেওয়াতে হবে। কারণ মুসলিমরা যেহেতু নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ফলে ভোট দেওয়াটা হলো তাদের কাছে নিজেদের কওম-এর প্রতি কর্তব্যবিশেষ।

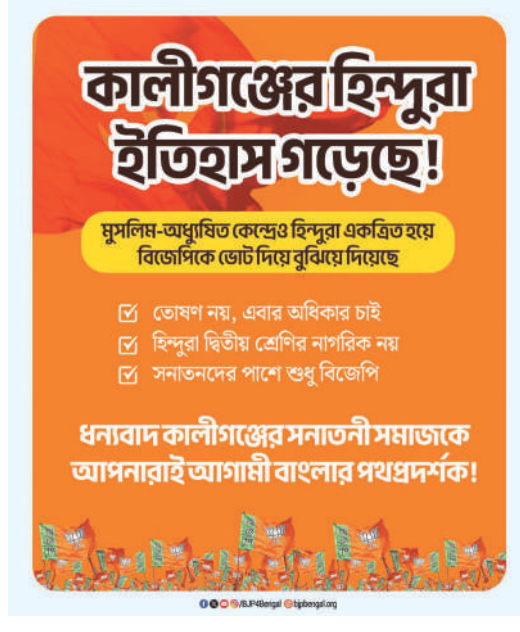

কিন্তু এখনো বহু হিন্দুর কাছে ভোটের দিনটা ছুটি ও পিকনিকের দিন হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই ট্রেন্ড নষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উপনির্বাচনেও একটি নৌকা ডুবে গিয়ে ভোটারদের আসতে অসুবিধা হলে সেখানে ভোটারদের আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বিজেপি। লক্ষ্য একটাই, যত বেশি সংখ্যক হিন্দুকে ভোটমুখী করা। এবং সেই লক্ষ্য সফল হয়েছে।

আগেই বলেছি উপনির্বাচন কেন্দ্রটি মুসলিম প্রধান। হিন্দু আছে ১,০৭,৮৪৬ যা কিনা মোট জনসংখ্যার ৪৩% এবং মুসলিম আছেন ১,৪৪,৯৩২, মোট জনসংখ্যার ৫৭%! এই দিনের উপনির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ১,৮৫,৬৬৪ অর্থাৎ ৭৩%। তার মধ্যে আনুমানিক হিন্দু ভোটার এর উপস্থিতি কমবেশি ৭১,০০০ অর্থাৎ ৬৯%। উপ নির্বাচনে সাধারণত একটু কম লোকেই ভোট দিতে আসে। সেখানে ৬৯% ভোট আসা মানে সেটা বড় জন জাগরণ এর ইঙ্গিত দেয়। আর এই হিন্দু ভোট এর মধ্যে বিজেপির পক্ষে ভোট পড়েছে মোটামুটি ৭৪% এরও বেশি! যেটা কিনা এই এলাকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২০২১ সালে বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৭০%, ২০২৪ সালে ৭২% আর ২০২৫ এর এই উপনির্বাচনে ৭৪% এরও বেশি। এই সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে দেয় যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হচ্ছে। যেটা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

এবং আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটেছে এই উপনির্বাচন। এখানে শিডিউল কাস্ট ভোট আছে ৩৫ হাজারের সামান্য বেশি। শিডিউল কাস্টের মানুষজনের ভোট পড়েছে ২৬ হাজারের সামান্য বেশি।

বিজেপি সেই শিডিউল কাস্ট ভোটের মধ্যে ২৪ হাজার ভোট পেয়েছে। বিজেপি কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল এসসি ডমিনেটেড কালীগঞ্জ টাউন এবং পলাশি টাউন এলাকায় ভোট গণনার সময়। খুব সম্ভবত যথাক্রমে নবম রাউন্ড এবং তের তম রাউন্ড গণনায়। এটা কিন্তু একটা খুব বড় দিক। যতই বিজেপির বিরুদ্ধে জাতপাতের

মুসলিম অধ্যুষিত বুথ গুলির তালিকা যেখানে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 'একক সংখ্যায়' সীমাবদ্ধ :-

Sl. No.	Polling Station No.	Total No. of Votes Polled	Vote received by BJP Candidate
1	3	467	1
2	4	468	3
3	5	682	8
4	6	712	8
5	7	735	6
6	8	491	5
7	9	567	7
8	18	651	6
9	35	781	5
10	36	769	8
11	40	520	4
12	41	545	2
13	45	729	7
14	49	510	9
15	50	474	6
16	52	644	7
17	58	476	8
18	62	577	8
19	63	542	9
20	64	414	4
21	66	753	9
22	75	305	5
23	77	558	6
24	78	495	4
25	79	505	7
26	81	387	7
27	88	590	7
28	90	563	8
29	91	337	4
30	92	408	2
31	93	501	6
32	94	491	6
33	95	565	8
34	96	421	5
35	97	520	2
36	99	713	7
37	133	494	6

মুসলিম অধ্যুষিত বুথ গুলির তালিকা যেখানে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 'একক সংখ্যায়' সীমাবদ্ধ :-

Sl. No.	Polling Station No.	Total No. of Votes Polled	Vote received by BJP Candidate
38	136	699	9
39	143	596	3
40	145	501	5
41	146	467	7
42	155	687	4
43	157	456	5
44	158	440	9
45	160	372	9
46	188	643	6
47	190	398	8
48	194	572	7
49	196	615	8
50	200	431	9
51	204	966	3
52	206	656	6
53	207	550	9
54	210	427	7
55	214	520	7
56	215	496	6
57	217	600	4
58	219	266	4
59	220	731	5
60	224	450	6
61	225	516	7
62	227	382	4
63	228	676	9
64	230	440	6
65	237	823	7
66	241	656	8
67	245	451	5
68	249	597	4
69	258	711	5
70	259	382	1
71	280	491	9
72	281	451	6
73	282	394	6
74	299	439	7

অত্যাচারের মিথ্যে অভিযোগ আনা হোক না কেন, এই রাজ্যে বিজেপির কোর ভোটার বেস শিডিউল কাস্টরাই। হিন্দুদের বিভাজিত করার কাস্ট রাজনীতির মিথ্যে প্রোপাগান্ডা যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো দাগ কাটতেই পারেনি তার প্রমাণ এই পরিসংখ্যাই।

এবার আসা যাক কিছু তথ্যে। আগেই বলেছিলাম যে বিজেপি মুসলিমদের আধুনিক মূলস্রোতের অংশ বানাতে চাইলেও মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। কোনো তথ্য প্রমান ছাড়া এমন অভিযোগ করা অবশ্যই অন্যায় হবে। তাই, এই উপনির্বাচন থেকেই কিছু তথ্য তুলে আনি।

মুসলিম অধ্যুষিত সমস্ত বুথেই বিজেপির প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা এককের ঘরে। ৩ নম্বর বুথে মোট ভোট পড়েছে ৪৬৭ টি কিন্তু বিজেপি পেয়েছে মাত্র ১ টি। ৯৭ নম্বর বুথে মোট ভোট দিয়েছে ৫২০ জন কিন্তু বিজেপি পেয়েছে মাত্র ২ টি। ১৪৩ নম্বর বুথে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯৬ ও ৩। ২৫৯ নম্বরেও ৩৮২ জনের মধ্যে মাত্র একজন বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত এমন ৭৪ খানা বুথ আছে যেখানে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা এক অংকের সংখ্যা ছাড়ায়নি।

এবং এই তথ্য এই বিষয়টাও প্রমাণ করে যে হিন্দু ভোট একত্রিত হয়েছে ও হিন্দুদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বেড়েছে বলে হিন্দুদের আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু হয়নি। কারণ মুসলিমরা ইতিমধ্যে এর থেকে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে আত্মসচেতন ও একত্রিত। ওই বিধানসভায় এমন একটাও হিন্দু অধ্যুষিত বুথ দেখা যাবে না যেখানে হিন্দু প্রধান এলাকা বলে কংগ্রেস বা তৃণমূলের মুসলিম প্রার্থী এক অংকের সংখ্যার ভোট পেয়েছে। কিন্তু উল্টোটা হয়েছে ৭৪ টা আসনে। ইতিমধ্যে নিজেদের কওমী সচেতনতা দ্বারা রেজিমেন্টেড মুসলিমদের থেকে শেখা উচিত হিন্দুদের, যে কিভাবে নিজের অস্তিত্বকে ব্যবহার করে সম্প্রদায়ের জন্য সুবিধা আদায় করে নিতে হয় রাজনৈতিক দলগুলি থেকে।

আর যদি হিন্দুরা এটা আসলেই শিখে যায় এবং যেভাবে নিজেদের একত্রিত করা শুরু করেছে সেই প্রবণতা জারি রাখে তাহলে ২০২৬ এ পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ডিএ নিয়ে ফেঁসে গেছে কালীরামের ঢোল

অভিরূপ ঘোষ

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতার টাকা দিলে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে। প্যানপ্যানে ঠুনকো যুক্তি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতা দিলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। এসব বাণী তৃণমূলের লোকজনেরাই বিশ্বাস করেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতা দিলে মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। ঘটনা হল মিড ডে মিলের অধিকাংশ বরাদ্দ আসে কেন্দ্রের তরফ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্য ছুটি দেয় এবং পেনশন দেয়। তাই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া যাবে না! এটা অনেকটা '১৫০০ কেজি বাচ্চা'-র মত কেস। আসলে বেদম ফেঁসে গ্যাছে।

"যে সরকার তার কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারে না সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই"। বক্তা বঙ্গ বিজেপির কেউ নন। একথা নিজের মুখে প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। অবশ্যই ক্ষমতায় আসার আগে। ক্ষমতায় আসার পর 'ডবল ডবল চাকরি' বা 'সততার প্রতীক' এর মত সব ক্ষেত্রে যেমন তাঁর মুখোশ খুলে পড়ে গেছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষমতায় আসার পরেই নিজের বক্তব্য থেকে একেবারে ১৮০° ঘুরে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পাবেন তাঁর ইচ্ছে হলে।

ঘটনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক অধ্যাপকরা মহার্ঘ ভাতা পান ১৮% হারে, যেখানে অধিকাংশ বিজেপি শাসিত রাজ্য সমেত কেন্দ্রীয় মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ ৫৫%। বলার অপেক্ষা রাখে না এই পার্থক্য আজকের নয়। বিগত বাম সরকারের সময় কেন্দ্র এবং রাজ্যের কর্মচারীদের বেশ কিছুটা বেতন পার্থক্য ছিল মহার্ঘ ভাতার কারণ। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেই পার্থক্য ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁয়েছে। রাজ্য সরকারের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল থেকে আরম্ভ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যন্ত প্রত্যেকেই বলেছেন মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তবু মুখ্যমন্ত্রী সে কথা কানেই তোলেননি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী তথা শিক্ষক অধ্যাপকদের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য চেষ্টার কসুর করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। মাত্র একবার একদম প্রথমে রাজ্য সরকারি ট্রাইবুনাল বাদে পরবর্তী যে ছয়টি রায় এসেছে এই মামলায় তার প্রত্যেকটি কর্মচারীদের পক্ষে। প্রত্যেকবার বলা হয়েছে মহার্ঘ ভাতা কর্মীদের অধিকার এবং তা মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। তৃণমূল সরকার তা মেটানো দূরের কথা উল্টে আইনের ফাঁক হলে পালানোর চেষ্টা করেছে প্রতিবার। শেষমেষ হাইকোর্টের উচ্চতর বেঞ্চে হেরে গিয়ে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার।

সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও এক নোংরা খেলা শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে প্রতিবার বাঙালি দেওয়া ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করে অভিষেক মনু সিংভির মত উকিল নিয়োগ করে রাজ্য না বিচার প্রক্রিয়া সওয়াল জবাবের জন্য নয়। যাতে করে আইনের ফাঁক গলে এবং বিভিন্ন অজুহাতে শুনানির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য। পাঠক অবাক হবেন এটা জেনে যে শেষ আড়াই বছরে ১৪ বার শুনানির তারিখ পেয়েও এক মিনিটও হেয়ারিং হয়নি এই মামলার। প্রতিবার শুধু তারিখ পিছিয়ে গেছে। সৌজন্যে অভিষেক মনু সিংভির মত রাজ্য নিয়োজিত উকিলরা। পিছনে দরজা দিয়ে এই উকিল এবং রাজ্য সরকারকে সাহায্য করে তৃণমূলের বি টিম বামেদের কর্মচারী সংগঠন এবং তৃণমূলের নিজস্ব কর্মী-শিক্ষক ক্রমাগত অন্তর্ঘাত করে গেছে সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে। ফল 'তারিখ পে তারিখ'। শেষমেষ বাম-তৃণমূলের তথাকথিত এমপ্লয়িজ ইউনিয়নগুলোর নির্লজ্জ বাধা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী কিছু সংগঠন এই মামলায় যুক্ত হয়। যথারীতি তারপরেই শুরু হয় শুনানি।

সেই শুনানির অংশ হিসাবে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেয় যে তারা যেন ৬ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ২৭ জুনের মধ্যে, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া (আগের পে কমিশনের, অর্থাৎ ২০০৯-২০১৯ সময়ের) ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না আদালতে চরম অবমাননা করে রাজ্য সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা মেটানোর নূন্যতম চেষ্টাও করেনি।

কেউ ভাবতে পারেন এতে তো আদালত অবমাননা দায় পড়ে যাবে তৃণমূল সরকার! হ্যাঁ পড়বে, কিন্তু তাতে দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষতি নয় বরং লাভই হবে। আদালত পদক্ষেপ নিলে তা হবে মুখ্যসচিব এবং খুব বেশি হলে অর্থসচিবের বিরুদ্ধে। কর্মচারীদের

কথা নূন্যতম না ভাবা তৃণমূলে সে ক্ষেত্রে কিছু এসে যাবে না। উল্টে নোংরা রাজনীতির ধারা বজায় রেখে এবারেও সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপকে কেন্দ্রের পদক্ষেপ হিসেবে দেখিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলতে সুবিধা হবে। এদিকে টাকাও দিতে হলো না, উপর থেকে রাজনৈতিক লাভ। ডবল ডবল চাকরি দেওয়ার ভাওতা দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর ডবল প্রফিট এক্ষেত্রে।

হ্যাঁ, কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা না দিয়ে দুদিক থেকেই প্রফিট করছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম লাভ অবশ্যই আর্থিক। বকেয়া ডিএর টাকা এমন ভাবে খরচ করছেন মুখ্যমন্ত্রী যাতে তাঁর দলে সদস্যদের লুটপাট করতে সুবিধা হয়। তৃণমূলের তোলাবাজ এবং গুন্ডাবাহিনী পকেট ভরতে কাজে লাগছে ওই টাকা। আর দ্বিতীয় লাভ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জনসমর্থন বাড়ানো। হ্যাঁ, মানুষকে ভুলই বোঝাচ্ছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতার টাকা দিলে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্র সমেত এই দেশের অধিকাংশ রাজ্য (বেশিরভাগই বিজেপি শাসিত) সরকার অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে। সেখানে উন্নয়ন স্তব্ধ তো হয়ইনি, উল্টে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক গুণ বেশি হারে হচ্ছে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ করা যায় না। অর্থাৎ বেতন খাতে বরাদ্দ টাকা থেকে কেটে 'উন্নয়ন' করা হচ্ছে এটা সর্বৈব মিথ্যে। সব থেকে বড় কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উন্নয়ন বলতে ইমামভাতা, নিজের পছন্দের ক্লাবকে টাকা দেওয়া, সরকারি খরচে সংস্কৃতি কেন্দ্রের নামে দীঘায় মন্দির তৈরি করা (রাম মন্দির একশো শতাংশ ভক্তদের দানের অর্থে হয়েছিল) আর সেই মন্দিরের প্রসাদ বিলির নামে সরকারি খরচে কিছু হালাল খাবার বিতরণ করা ছাড়া আর কিছুই নেই।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতা দিলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ইত্যাদি রাজ্য প্রায় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেয়। এবং সে রাজ্যে মহিলারাও আমাদের রাজ্যের মা বোনেদের থেকে কয়েক গুণ বেশি টাকা পান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহার্ঘ ভাতা দিলে মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। ঘটনা হল মিড ডে মিলের অধিকাংশ বরাদ্দ আছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রাইমারিতে দৈনিক ছাত্রপিছু বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্র দেয় ৪.০৭ টাকা। অপরদিকে হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দৈনিক ছাত্রপিছু বরাদ্দ ১০.১৭ টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্র দেয় ৬.১০ টাকা। যেখানে একটা প্রকল্পের ৬০% টাকা শুধু কেন্দ্র দেয় সেখানে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দিলে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিড ডে মিলকেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রকল্প বলে চালান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্য ছুটি দেয় এবং পেনশন দেয়। তাই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া যাবে না! মিথ্যা এখানেও। গরম এবং পুজোর ছুটি সমেত এ রাজ্যের শিক্ষকরা বছরে মোট ৬৫ (৩ দিন পালনীয় সমেত) দিন ছুটি পান। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সেটা ৮২ থেকে ৮৫। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র ব্যাপারটা কম বেশি একই রকম। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীরাও গণেশ চতুর্থী, বিশ্বকর্মা পুজো, বাসন্তী পুজো সমেত একাধিক ছুটি থেকে বঞ্চিত। ভোট ব্যাংকের কথা ভেবে ঈদ এবং মহরমে দু একদিন অতিরিক্ত ছুটি দিয়ে তাদের পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যা তাঁরা কেউ নিতে চান না। রইল পেনশন। কেন্দ্র তথা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো প্রতি মাসে মূল বেতনের ১৮ শতাংশ জমা করে কর্মচারীদের পেনশন খাতে, যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শূন্য। হিসাব করে দেখা যায় রাজ্যের বর্তমান পেনশন স্কিমের থেকে কেন্দ্রের উনিফাইড পেনশন স্কিম অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং কর্মচারীদের জন্য লাভদায়ক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যের আয় কম এবং কেন্দ্র থেকে নাকি কম টাকা আসে তাই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া সম্ভব নয়। বক্তব্য অর্ধ সত্য। রাজ্যের আয় কম এটা ঠিক। শিল্প নেই, ব্যবসায় কাটমানি দিতে হয় তৃণমূলের ছোট মেজো বড় নেতাকে। আয় থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায় ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরও যদি তিনি রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়াতে না পারেন তবে সেটা তাঁর ব্যর্থতা। এই অংশ সত্যি হলে মিথ্যে এটাই যে কেন্দ্র থেকে টাকা আসে না। বর্তমানে দাঁড়িয়ে গোটা দেশে যে চারটি রাজ্য কেন্দ্রীয় করের সবথেকে বেশি অংশ পায় পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে একটি। শেষ কয়েক বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। কিন্তু সেটা টাকা খেলা-মেলা-উৎসব-ইমাম ভাতা-আত্মপ্রচার-ভাইপোপ্রচার-কাটমানি আর ক্লাবগুলোকে অনুদানে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। তাই কেন্দ্রের প্রকল্পকে নিজের নামে দেখিয়ে প্রচার করা ছাড়া উন্নয়ন প্রদর্শনের অন্য কোন রাস্তা নেই তৃণমূলের কাছে। আর যেহেতু মহার্ঘ ভাতা দিতে হয় রাজ্যকেই তাই এক্ষেত্রে তথ্যগত জোচ্চুরি করার কোন সুযোগ না থাকায় সেখান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে তৃণমূল সরকার। ওহ হ্যাঁ, এপ্রিল মাসের তিন তারিখ তৃণমূলের মদতে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া কিছু শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও রাজ্য সে টাকা ফেরত নেয়নি। 'আয় কম' থাকা একটা রাজ্য কেন নিজস্ব কোষাগরের অর্থ ফেরত চাইছে না সেটা বোঝা কষ্টকর নয়।

এই প্রবন্ধ শেষ করবো এক অত্যাশ্চর্য তথ্য দিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছর পর পে কমিশন বসায় রাজ্য। কেন্দ্র এবং বাকি রাজ্যগুলোর চার বছর পর চালু হয় তা। এই চার বছরের বকেয়া টাকা দেয়নি রাজ্য। অবাক করা তথ্য এটা নয়। অবাক করার ঘটনা এটাই যে স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার কোন রাজ্যের পে কমিশন রিপোর্ট সর্বভারতীয় অর্থমূল্য সূচকের বদলে শাসকের মর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার বিষয়টা। বঞ্চনার তালিকা লম্বা। আর সম্ভবত তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকলে সে তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে।

ছবিতে খবর

রাজ্য বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি হলেন শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। তাঁকে বরণ করে নিলেন বঙ্গ বিজেপির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ সম্মানীয় কেন্দ্রীয়-রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিজেপি কার্যকর্তাগণ।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে 'ফুটবল ফর স্কুল' কর্মসূচির শুভ সূচনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং শ্রী শান্তনু ঠাকুর। আগামী দিনে রাজ্যের ১১,০০০ বিদ্যালয় এই প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং প্রায় ৮০,০০০ ফুটবল বিতরণ করা হবে।

ফালাকাটার কুঞ্জনগর সহ সারা রাজ্যে মহিলাদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ফালাকাটা থানা ঘেরাও কর্মসূচী।

কসবা আইন কলেজের ছাত্রীকে তৃণমূল নেতাদের গণধর্ষণের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে প্রতিবাদ মিছিলে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কসবা 'ল'-কলেজের ছাত্রীকে কলেজের ভিতরে নারকীয় গণধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতা জেলা মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং মশাল মিছিল।

জরুরী অবস্থা জারি-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সল্টলেকে এক সেমিনারে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ও রাজ্য নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

প্রদেশ কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য পর্যবেক্ষক শ্রী সুনীল বনসল, সহ-পর্যবেক্ষক শ্রী অমিত মালব্য সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব।

চাকরি হারানো শিক্ষকদের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করলেন রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে।

কসবা 'ল'- কলেজে নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কসবা থানা ঘেরাও কর্মসূচি।

রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনের প্রদেশ দফতরে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের প্রথম সাংগঠনিক বৈঠক।

কসবা 'ল'-কলেজের ছাত্রীকে কলেজের ভিতরে নারকীয় গণধর্ষণের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং মশাল মিছিলে উপস্থিত সম্মানীয় জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

কাঁথি সাংগঠনিক জেলায় বিশেষ সাংগঠনিক কর্মশালায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শাসকদলের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে খেজুরি বিধানসভার কামারদা বাড় দেউলপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ - এর পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে ৯টি আসনের ৮টি আসনে জয়লাভ বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের।

গত ১০ বছর তৃণমূলের দখলে থাকা গাইঘাটা সমবায় নির্বাচনে ১২ টি আসনের মধ্যে ১২ টি আসনে জয়লাভ বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের।

খেজুরি বিধানসভার কশতলা দ্বারিকানাথ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনে ১২টি আসনের সবকটিতেই বিপুল ভোটে জয়লাভ বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের।

ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের নবদ্বীপ সাংগঠনিক জোনের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী ও সম্মানীয় জেলা নেতৃত্ব।

জেলায় জেলায় ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিবসে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৮-এর ১লা ডিসেম্বর নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি গোপন চিঠিতে লিখলেন, সর্বত্র নাকি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে শ্যামাপ্রসাদ নিজের দপ্তরটিকে একটি ছোটখাট বাংলা বানিয়ে ফেলেছেন। ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি আবার নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখে জানান যে শ্যামাপ্রসাদের দপ্তরে নাকি গেজেটেড পদে অতিরিক্ত বাঙ্গালী নিয়োগ হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এর মাত্র কিছুদিন আগেই ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালী হিন্দুদের কচুকাটা করা শুরু হয়েছে। নেহরু সেসব না ভেবে তখনও শ্যামাপ্রসাদের পিছনে লাগতে, তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে ব্যস্ত।

দেশের স্বাধীনতা লাভের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রধান বাঙ্গালী নেতা। জিন্নাহ-র গ্রাস থেকে বাংলার পশ্চিমের বেশ কিছু অংশ ছিনিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন এবং সেসময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী জিন্নাহ-র সাধের কলকাতা-কে ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত রাখা তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ফলে হিন্দু মহাসভার নেতা হয়েও তৎকালীন কংগ্রেসি নেতারা শ্যামাপ্রসাদের নাম প্রথম মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত করেন। এই ব্যাপারে গান্ধীজীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবু শ্যামাপ্রসাদের মনে কিছু দ্বন্দ্ব ছিল মন্ত্রীসভায় যোগদান করা নিয়ে। কিন্তু সাভারকারও তাঁকে মন্ত্রীসভায় যোগদান করারই পরামর্শ দেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শিল্প ও সরবরাহ (Industry and Supply) তাঁকে দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁর পক্ষে অধিক উপযোগী হত শিক্ষাদপ্তর। কারণ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ নিজের জীবনের অধিকাংশ সময়েই শিক্ষার সেবায় কাটিয়েছেন। তিনি দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হলে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন এবং দেশের তরুণ সমাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিথ্যা ইতিহাস পড়তে বাধ্য হত না। বলরাজ মাধোক তাঁর 'Portrait of a Martyr' গ্রন্থে দুঃখ করে বলছেন মৌলানা আজাদ তাঁর ব্যক্তিগত এজেন্ডা রূপায়ণ করার জন্য এই দপ্তর নিজের হাতে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যাই হোক, তা সত্ত্বেও শিল্প দপ্তরের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তাঁকে প্রদান করা কংগ্রেসি নেতৃত্বের তাঁর প্রতি আস্থাই প্রমাণ করে। পূর্বে অখণ্ড বাংলার শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবেও প্রায় এক বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন- এটাই হয়ত তাঁকে শিল্পমন্ত্রক দেওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে। যাই হোক, এই দপ্তরে দায়িত্ব পাওয়ার ফলে ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তিস্থাপন ও ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্প বিকাশের রূপরেখা তৈরি করার সুযোগ পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। মাধোক বলেছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা ক্ষতি হল অর্থনীতি এবং শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে তা পূরণ হয়ে গেল।

রয়টার্স গুডউইল মিশনে লর্ড ল্যাটনের সঙ্গে আলোচনারত নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৪৮-এর ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার যে শিল্পনীতি প্রকাশ করে তাতে শিল্প সংক্রান্ত শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। এই নীতির মূল কথা ছিল মিশ্র অর্থনীতি যেখানে সরকারের একটা সর্বব্যাপী ভূমিকা থাকবে শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও উন্নতির জন্য। এতে বলা হল রাষ্ট্র বা সরকার প্রয়োজনে কোন শিল্প অধিগ্রহণ করতে পারবে বটে, কিন্তু বেসরকারী শিল্পোদ্যোগেরও একটি বিশেষ জায়গা ও ভূমিকা থাকবে। শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে যাবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য সমস্ত শিল্পোদ্যোগকেই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম শ্রেণীতে থাকবে সেই সব শিল্প যার পরিচালনা ও মালিকানা দুই' ই থাকবে সরকারের হাতে- এর মধ্যে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও রেল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরকারের একটি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা থাকবে, কিন্তু বেসরকারী শিল্পকে সরকারী শিল্পের পরিপূরক হতে হবে। এর মধ্যে থাকবে কয়লা, ইস্পাত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, জাহাজ নির্মাণ এবং খনিজ তেল। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে বাকি যাবতীয় শিল্প যা পুরোপুরি

বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু সেখানেও সরকারের একটা নীতি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থাকবে। এই শ্রেণীতে থাকবে সার, সুতি ও পশম বস্ত্র, কাগজ ইত্যাদি শিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ের কথাও এই নীতিতে বলা হয়েছিল।

এই নীতি অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদ চারটি অগ্রগণ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। এগুলি হল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (চিত্তরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গ), হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটস্ (ব্যাঙ্গালোর), সিন্দ্রি ফার্টিলাইজার (সিন্দ্রি, বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড) এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। কারখানাগুলি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন এখানে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ভারতবর্ষে প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা (তখন ইঞ্জিন মানে কয়লা বা বাষ্পের ইঞ্জিন)। এর আগে ইঞ্জিন এবং তার সব যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। পনের কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটি তৈরি হয় এবং ১৯৫০-এ কারখানা থেকে প্রথম ইঞ্জিন বেরোয়।

তদানীন্তন বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের) ধানবাদের অদূরে একটি গ্রাম ছিল সিন্দ্রি। সারের সমস্যা মেটানোর জন্য এখানে একটি কারখানার পরিকল্পনা করা হয় যেখানে বছরে সাড়ে তিন লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হবে এবং এর বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হবে তাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি সিমেন্ট কারখানারও পরিকল্পনা করা হয়, যা বছরে ১ লক্ষ টনের ওপর সিমেন্ট উৎপাদন করবে। এর জন্য একটি বিদ্যুৎ কারখানারও পরিকল্পনা করা হয় যা শুধু এই কারখানা দুটিকেই নয় গোটা বিহারকেই বিদ্যুৎ যোগাবে। এই কারখানার পরিকল্পনা শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বের একেবারে শুরুতে ১৯৪৭-এই করা হয়েছিল। এই সার কারখানা সরকারের প্রথম শিল্পোদ্যোগের একটি হওয়ার কারণে শ্যামাপ্রসাদকে নানারকম আমলাতান্ত্রিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দক্ষ হাতে শ্যামাপ্রসাদ সেসবের সমাধান করে কারখানার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

দামোদর নদের বন্যার কারণে তদানীন্তন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। ১৯৪৮-এ ঠিক করা হয় যে একটি কর্পোরেশন গঠিত হবে যার মালিকানা থাকবে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের হাতে। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ জলপথ, বনসৃজন, ভূমিক্ষয় রোধ, জমির যথাযথ ব্যবহার, উৎখাত হওয়া মানুষের পুনর্বাসন, জনস্বাস্থ্য এবং সাধারণভাবে দামোদর নদের উপত্যকার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। এই পরিকল্পনায় ছিল ৮টি জলাধারবিশিষ্ট বাঁধ (ড্যাম), কিন্তু শেষপর্যন্ত তৈরি হয় ৪ টি – দামোদরের উপনদীগুলির ওপর তিলাইয়া, মাইথন ও কোনার এবং দামোদরের ওপর পাঞ্চেত। পুরো পরিকল্পনা শেষ হবার অনেক আগেই অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন।

ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে মহানদীর ওপর হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্পও শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সেচের জল ছাড়াও পশ্চিম ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগায় এই প্রকল্প। শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বকালেই মধ্যপ্রদেশে একটি কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরির কল সরকারী মালিকানায় চালু হয় এবং কারখানার নামানুসারে জায়গাটির নাম হয় নেপানগর।

পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সহযোগিতা তাঁর মন জুড়ে ছিল, সেখানে মার্কসবাদী চিন্তার শ্রেণী- সংগ্রাম কখনো স্থান পায় নি। এই শ্রেণীসংগ্রাম করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে বামপন্থীরা প্রায় ৫৬,০০০ কলকারখানা বন্ধ করিয়েছে- যার ফল আজকের এই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি। শ্রমিক সম্প্রদায় যেমন তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতির আশ্বাস পেয়েছিল তেমনি শিল্প মালিকরাও জানতেন যে তিনি তাঁদের সমস্যা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করবেন। ১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরিজ্ আইনে বলা হয় কোন কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে তার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব কারখানার মালিককে নিতে হবে। এই আইন লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ কারখানায় শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার প্রায় দু' বছর পর একটি শ্রমিক-ম্যানেজমেন্ট বিরোধ বাঁধে। তখন শ্রমিকরা জানায় যে শ্যামাপ্রসাদ যদি এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন তাহলে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন- তা শ্রমিকরা মেনে নেবে। এথেকেই শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রমিকদের আস্থার প্রমাণ মেলে।

দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ দেশলাই শিল্প, সুতি বস্ত্র শিল্প প্রভৃতির কিছু সমস্যারও সমাধান করেন। এক সুইডিশ

সংসদের সেন্ট্রাল হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডার শ্রদ্ধা অর্পণ।

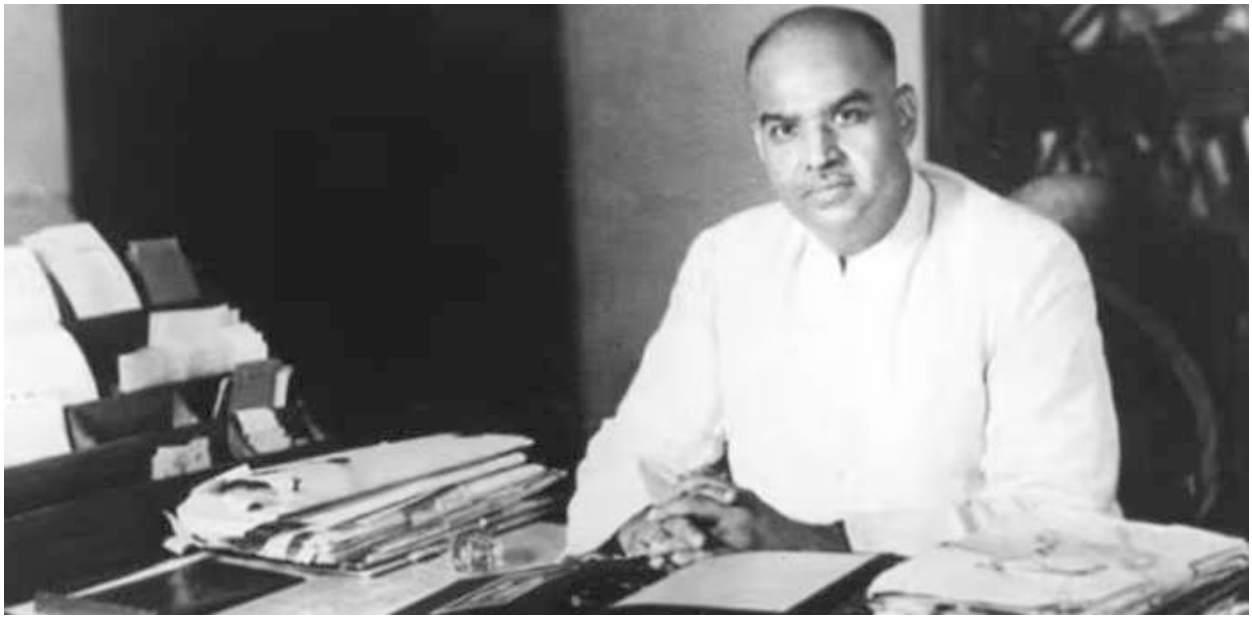

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

শিল্পপতির শিল্পসংস্থা উইমকো-র দেশলাই কারখানা ছিল অমরনাথ, মাদ্রাজ, বেরিলি, কলকাতা ও ধুবড়িতে। বর্তমান তামিলনাড়ু-র শিবকাশী এলাকায় দেশলাইয়ের বেশ কিছু কুটির শিল্প ছিল। তারা অভিযোগ জানায় যে উইমকো-র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। এই সমস্যার নিরসনকল্পে শ্যামাপ্রসাদ প্রথমত হাতে তৈরি দেশলাইয়ের ওপর কর (এক্সাইজ ডিউটি) কমিয়ে দিলেন, প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরেট, গন্ধক এবং ফসফরাস আমদানির ব্যবস্থা করলেন এবং এই কুটির-শিল্পজাত দেশলাইয়ের দেশ জুড়ে সুবিধাজনক শুল্কে বিতরণের সুবিধা করে দিলেন। বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কেনার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এইসব কুটির শিল্প মাঝেমধ্যে পারিবারিক অশান্তির কারণে বন্ধ হয়ে যেত। শ্যামাপ্রসাদ তদানীন্তন মাদ্রাজ সরকারকে দিয়ে এদের সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে আনলেন এবং কাঁচামাল কেনা ও তৈরি জিনিস বিক্রির সুবিধাজনক শর্তে সরকারী ঋণেরও ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে এই শিল্পের ৯০% সমস্যা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন পশম, কলে তৈরি সূতি বস্ত্র ও তাঁত বস্ত্রের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ নজর দেন। হস্তচালিত তাঁতে বোনা পশমবস্ত্রের জন্য শ্যামাপ্রসাদ সমবায় গঠন করে একই ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেন। সরকারের তরফ থেকে প্রচেষ্টা হল এদের প্রযুক্তি ও বাজারজাত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করানো। হস্তশিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় পশম প্রযুক্তি কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় বিপণি খোলা হল।

সূতি তাঁতশিল্পের অবস্থাও তখন একটু সংকটে ছিল। সে সময় এতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ কর্মরত ছিলেন। রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ তৈরির জন্য শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের কিছু নমুনা বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের বাণিজ্যিক আধিকারিকদের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে রাজী করালেন খাদি এবং হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের ব্যবহারের জন্য। রেলকে রাজী করালেন এর মাশুল কমাবার জন্য। উত্তরপ্রদেশের হরদুয়ারগঞ্জে একটি কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প শিক্ষালয়ও তৈরি করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা তাদের কাজে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন নকশা সৃষ্টি করতে পারেন।

মাত্র আড়াই বছরের মন্ত্রিত্বকালে শ্যামাপ্রসাদ কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হন। তথাগত রায় তাঁর 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮-এর ১লা ডিসেম্বর নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি গোপন চিঠিতে লিখলেন, সর্বত্র নাকি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে শ্যামাপ্রসাদ নিজের দপ্তরটিকে একটি ছোটখাট বাংলা বানিয়ে ফেলেছেন। ১৯৫০-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখে জানান যে শ্যামাপ্রসাদের দপ্তরে নাকি গেজেটেড পদে অতিরিক্ত বাঙ্গালী নিয়োগ হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এর মাত্র কিছুদিন আগেই ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালী হিন্দুদের কচুকাটা করা শুরু হয়েছে। নেহরু সেসব না ভেবে তখনও শ্যামাপ্রসাদের পিছনে লাগতে, তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে ব্যস্ত। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর হিন্দু নির্যাতনের কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে নেহরু বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষে আত্মঘাতী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ১৯৫০-এর ৮ই এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে (যা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে খ্যাত)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরু-র বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুর স্বার্থ রক্ষার্থে অনীহা বুঝে পদত্যাগ করেন। ফলে আরও অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির অনেক সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

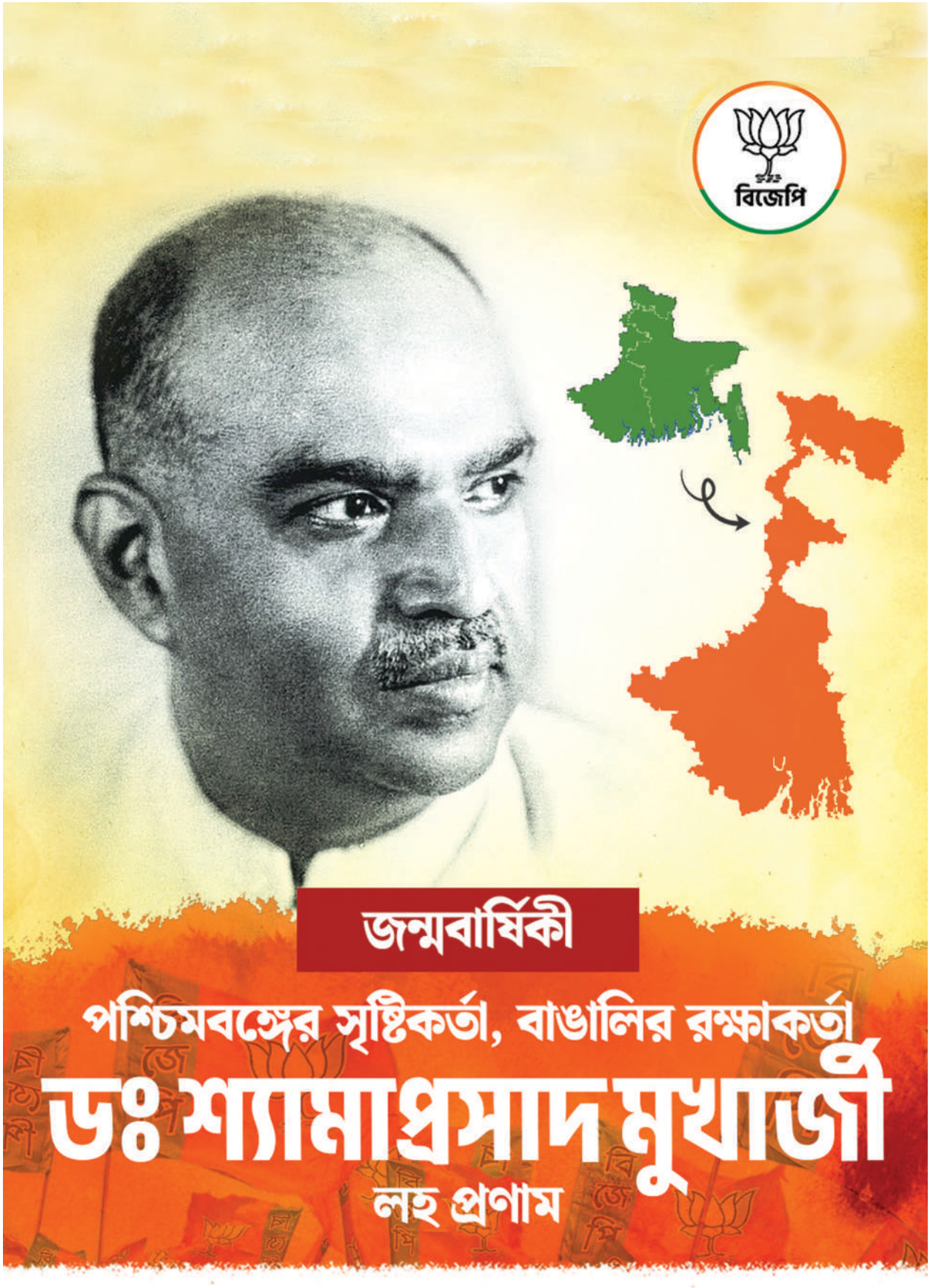
বিজেপি
জন্মবার্ষিকী
পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা, বাঙালির রক্ষাকর্তা
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
লহ প্রণাম
/BJP4Bengal
bjpbengal.org

বিস্মৃত নদিয়ার 'পন্ডিত'

রণদৃপ্ত শীল

ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফকে। একটি সুপরিকল্পিত মানচিত্র তৈরি হয়েছিল, কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তাতে করে ফেলেছিলেন, মস্ত একটি ভুল! তাঁর মানচিত্র অনুযায়ী নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগণার সিংহভাগ চলে যায় পাকিস্তানে। লীগপন্থী সমর্থকদের কাছে এ যেন 'মেঘ না চাইতে জল'! কিন্তু তাদের এই ক্ষণিকের অভিলাষ-কে কেড়ে নিয়েছিলেন এক ব্যক্তি, ভারতীয় গণ পরিষদে তিন পন্ডিতের এক পন্ডিত - পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র!

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন সকল ভারতবাসী স্বাধীন ভারতের মাটিতে তেরঙা পতাকা তুলে স্বাধীনতার উৎসবে মেতে উঠেছিল, ঠিক তখনই একরাশ আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা নিয়ে স্তম্ভিত ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার মানুষ। আর সকলের মত, তারাও স্বদেশের স্বাধীনতার দিনটি উদযাপন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, তাদের জেলায় সদ্য নির্মিত দেশ পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে মুসলিম লীগের সমর্থকরা! বিপ্লববাদ তথা সাম্প্রদায়িকতার বহ্নিশিখা থেকে বাঁচতে অখন্ড ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা তথা রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফকে। একটি সুপরিকল্পিত মানচিত্র তৈরি হয়েছিল, কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তাতে করে ফেলেছিলেন, মস্ত একটি ভুল! তাঁর মানচিত্র অনুযায়ী নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগণার সিংহভাগ চলে যায় পাকিস্তানে। লীগপন্থী সমর্থকদের কাছে এ যেন 'মেঘ না চাইতে জল'! কিন্তু তাদের এই ক্ষণিকের অভিলাষ-কে কেড়ে নিয়েছিলেন এক ব্যক্তি, ভারতীয় গণ পরিষদে তিন পন্ডিতের এক পন্ডিত - পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র!

লক্ষীকান্ত মৈত্র। তাঁর জন্ম ১৮৯৫ সালের ২২শে জুলাই, অধুনা বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে। তাঁর পিতার নাম ছিল রজনীকান্ত মৈত্র। ছেলেবেলার দিনগুলি কেটেছে নারায়ণগঞ্জে। তাঁদের পৈতৃক বাড়ি

(বাঁদিকে) জহরলাল নেহরু, (মাঝে) সিরিল র‍্যাডক্লিফ এবং (ডান দিকে) মহম্মদ আলি জিন্না।

ছিল নদিয়া জেলার শান্তিপুরে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন পন্ডিত মৈত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য সাংখ্য ও তীর্থ ডিগ্রি ধারণ করে 'পন্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি। প্রথম জীবনে ব্যারিস্টারি করে বেশ নাম করেন কিন্তু ১৯২১ সালে মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিতে, তখন সেই পেশা ত্যাগ করলেন। শান্তিপুরের বাড়িতেই স্বদেশী ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে 'শিল্পাশ্রম' তৈরি করলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে যোগ দেন পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের "জাতীয় কংগ্রেস দলে"। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বৃটিশ আইনজীবী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ভুলের ফলে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগণার সিংহভাগ, বিশেষ করে, নদিয়ার বৈষ্ণব প্রধান অঞ্চল চলে গিয়েছিল পাকিস্তানে। অনিশ্চয়তায়, মানুষ। অথৈ জলে পড়েছেন নদিয়ার মহারাণী জ্যোতিময়ী দেবী। প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন পন্ডিত মৈত্র! পাশে দাঁড়ালেন রাণীমার। এই সংগ্রামে তাঁর সাথী হলেন পরম হিতৈষী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসেফ আলি মীর্জা। পাকিস্তানে 'ভুলবশত' চলে যাওয়া সেই স্থানগুলিতে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে লীগ কর্তৃক

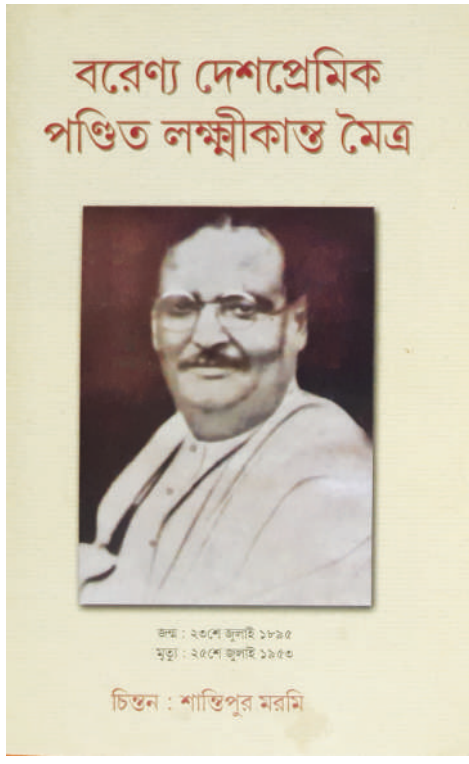

পাশবিকতার নগ্ন নৃত্য! পন্ডিত মৈত্র দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে, তাঁকে বোঝালেন, র‍্যাডক্লিফ কৃত ভুলের পরিণামের কথা! তারপর এই ঘটনা গেল বৃটিশ প্রশাসনের কানে। ভুলের সংশোধন করলেন র‍্যাডক্লিফ, নিদারুণ লজ্জা ও অবিরাম হত্যালীলা থেকে রক্ষা পেলো নদিয়া , উত্তর চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ! স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গেরই সদস্য হল তারা।

১৯৪৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিপুর কলেজের। রবি ঠাকুরের আদর্শ এবং রবীন্দ্র ভাবনার তীব্র অনুরাগী ছিলেন পন্ডিত মৈত্র। তাই হয়তো তাঁর গড়ে তোলা শান্তিপুর ও তার শিক্ষা, সংস্কৃতিতে রয়েছে শান্তিনিকেতনের স্পর্শ। ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ থেকে জয়ী হয়েছিলেন পন্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। ভারতের সংবিধান নির্মাণের সময় গণ পরিষদে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যপদ লাভ করেন। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন পন্ডিত মৈত্র। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর সেই প্রস্তাব না-মঞ্জুর হয়েছিল। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য, ইত্যাদি বহু সদস্য পদের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনি। এই দক্ষ, বাগ্মী ও পরিণামদর্শী মানুষটি প্রয়াত হন ১৯৫৩ সালের ২৫শে জুলাই। সময়ের সাথে বাঙালি জাতির সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও জাতীয় স্তরে বাঙালির প্রতিনিধি, নদিয়ার 'পন্ডিত' বিস্মৃতির অতলেই রয়েছেন আজও।

তথ্যসূত্র:

১। উইকিপিডিয়া।

২। একশো পঁচিশে সাংসদের বাঙালি পন্ডিত (প্রবন্ধ) - হারাধন চৌধুরী (সূত্র: বর্তমান পত্রিকা)।

৩। লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। নদিয়া জেলার কৃতি সন্তান (প্রবন্ধ) - মলয় দে।

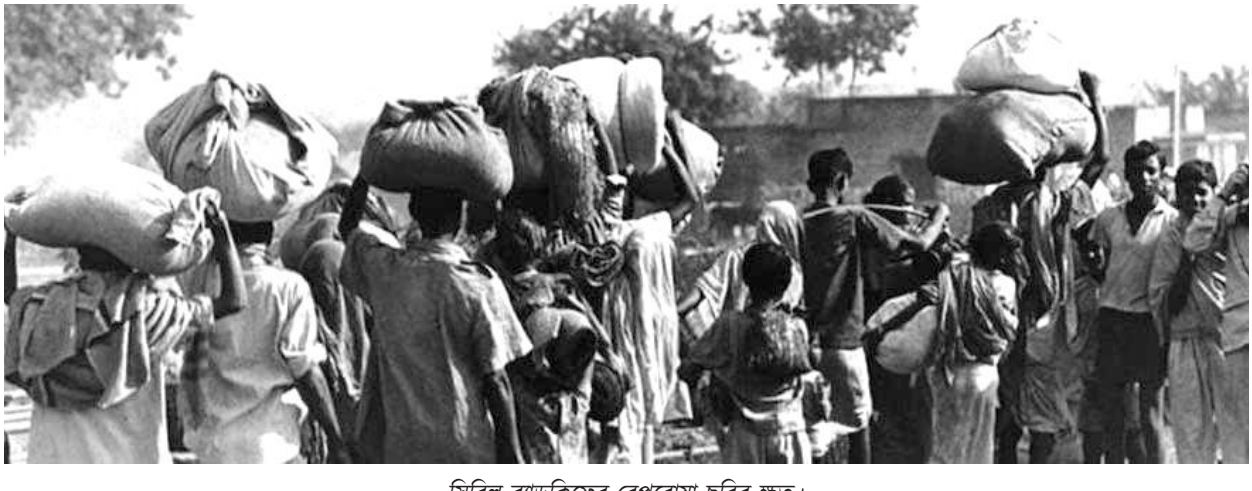

সিরিল র‍্যাডক্লিফের বেপরোয়া ছুরির ক্ষত।

জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে বাংলা

- কসবা থেকে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর পরিচয়ে বসবাসকারী ৩ যুবককে গ্রেফতার করলো NIA এবং দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল
- বছরের পর বছর কলকাতাতেই বসবাস করতো ওই ৩ যুবক
- কলকাতায় বসেই তারা সরাসরি সিরিয়ার একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতো
- রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্লিপার সেল গুলিকে সক্রিয় করার কাজ করতো তারা

রাজ্য পুলিশ বা গোয়েন্দারা কেনো কিছু টের পেলো না?

নাকি ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে তাদেরকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিলো?

/BJP4Bengal bjpbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

হরিপদ ভারতী থেকে শমীক ভট্টাচার্য

একনজরে রাজ্য বিজেপি সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিনয়ভূষণ দাশ

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি সর্বদা প্রচার করে থাকে যে সব শিক্ষিত মানুষেরা নাকি কম্যুনিস্ট পার্টি করে আর অন্য পার্টিগুলি যেন সব অশিক্ষিতে ভরা। যদিও তাঁদের দাবী বাস্তবের সঙ্গে কখনোই মেলেনি, মেলেনা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য সুবক্তা, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপ্তি বিশাল। তিনি দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী। বিভিন্ন সময়ে দলের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি এক অভিজ্ঞ কার্যকর্তা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে তিনি সামাজিক কার্যকর্তার জীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিজেপিতে যোগদান দেন।

এই দলে শুরু থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মর্যাদার উপর আধারিত এই দল। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ রাজ্যে বিজেপির অস্তিত্ব বর্তমান। বস্তুত বিজেপির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই রাজ্যে দলের সংগঠন বিদ্যমান। ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এই রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় জনসঙ্ঘ তথা বিজেপির শুরু থেকেই বাঙালি মনীষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ তিনবার জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়াও রাজ্যের অনেক প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন এই দলের সঙ্গে।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ছিলেন জনসংঘের শেষ রাজ্য সভাপতি। আবার ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনসংঘের উত্তরসুরী ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হলে অধ্যাপক হরিপদ ভারতীই হলেন রাজ্যের প্রথম বিজেপি সভাপতি। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিএম) সর্বদা প্রচার করে থাকে যে সব শিক্ষিত মানুষেরা নাকি কম্যুনিস্ট পার্টি করে আর অন্য পার্টিগুলি যেন সব অশিক্ষিতে ভরা । যদিও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের দলের সর্বোচ্চ স্তরে স্নাতকস্তরের বেশী শিক্ষিত কাউকে দেখা যায়নি। সে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু বা সূর্যকান্ত মিশ্র যেই হোন। তাঁদের এই বড়াই বাস্তবের সাথে একেবারেই মেলেনা। বরং তথাকথিত দক্ষিণপন্থী দল কংগ্রেস বা ভারতীয় জনসঙ্ঘ বা অধুনা ভারতীয় জনতা পার্টিতে সর্বোচ্চ স্তরে উচ্চশিক্ষিতের হার অনেক বেশী। প্রথম সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অসীম ঘোষ বা হাল আমলের ডঃ সুকান্ত মজুমদার ---- এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষ।

যাইহোক, ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতিদের ধারাবাহিক একটা তালিকা এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে লিপিবদ্ধ করছি।

১। অধ্যাপক হরিপদ ভারতী (২৮ জুন, ১৯২০–১৯ মার্চ, ১৯৮২) -- অধ্যাপক হরিপদ ভারতী তাঁর অনুগামীদের কাছে 'মাস্টার মশাই' বলে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। তিনি হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন যশোহরের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে দর্শনের অধ্যাপকরূপে। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এই দলের রাজ্য শাখার সভাপতি এবং দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দেশে জরুরী অবস্থা জারি হলে তিনি 'মিসা' আইনে কারারুদ্ধ হন। তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী করে রাখা হয়। জেলে অবস্থানকালে স্ত্রীকে লেখা তাঁর পত্রাবলী সম্পাদনা করে লেখেন, 'জেলে মিসা, বাইরে মিসা' নামের এক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। ১৯৭৫ সালে জারি করা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় আমাদের দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জেলে সত্যাগ্রহীদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছিল তার অনুপঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

১৯৮০ সালে পূর্বতন জনসংঘের সদস্যদের নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হলে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁকে রাজ্যের সভাপতি এবং সর্বভারতীয় সহ- সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

সুন্দরসিং ভান্ডারীর সাথে তাঁকেও দলের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম রাজ্য সভাপতি ছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি তাঁর বাগ্মিতা ও দয়ালু ব্যবহারের জন্য দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর মত অসাধারণ বাগ্মী এ রাজ্যের রাজনীতিতে খুব একটা দেখা যায়না। তিনি সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর রাজত্বকালে মরিচঝাঁপিতে হিন্দু দলিত উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার এবং নিপীড়ন চালানো হয়। কয়েকশো হিন্দু উদ্বাস্তুকে আগুন লাগিয়ে, গুলি করে এবং নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়। অত্যাচারিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি মাত্র কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে পুলিশের চক্ষে ধুলো দিয়ে ছোট নৌকায় করে মরিচঝাঁপির অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে যান; কিন্তু সিপিএম তাঁর এই অভিযান বাতিল করে দেয়। ৫-৬ টি নৌকা নিয়ে পুলিশ তাঁকে মাঝ নদীতে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিধানসভায় তিনি মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার কথা তুলে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। জরুরী অবস্থার সময় তিনি সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে তিনি উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তাঁর বাগ্মিতা এবং বহুমুখী বিষয়ে জ্ঞানের জন্য তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

২। অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী (২ মে , ১৯২৯–১৭ এপ্রিল ২০০৫) – অধ্যাপক ভারতীর পরে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি হন অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। তাঁর পরিবার আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। পরবর্তীকালে তারা উত্তরপ্রদেশের বারানসী এবং সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গেই তাঁর জন্ম, বেড়ে উঠা ওঠা পড়াশোনা করা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ , এল এল বি এবং এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। তিনি শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের লেকচারার হিসেবে নির্বাচিত হন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে । ওই বিভাগেরই অধ্যাপক হন পরবর্তীকালে। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে জনসংঘের নতুন রূপ, ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হন। তিনি বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯৮২- ৮৬ এবং ১৯৯৬-৯৮ সালে। এছাড়া দলের জাতীয় সহ-সভাপতি (১৯৮৮-৯৩), জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য (১৯৮০-৯৯) ছিলেন। তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন (১৯৯২-৯৮)।এছাড়াও তিনি হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত ছিলেন। হিন্দি সাহিত্য জগতেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি বারোটি গ্রন্থ, তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ এবং বেশ কয়েকটি পুস্তকের সম্পাদনা করেন। তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন।

৩। শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়– রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিবেদিতপ্রাণ স্বয়ংসেবক ও প্রচারক ছিলেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতার আগেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ জনসঙ্ঘের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৮০ সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির সাথে যুক্ত হন। তিনি দুটি টার্ম, ১৯৮৬-১৯৯১ এবং ২০০৬-২০০৮ সালে রাজ্যের বিজেপি সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও সাধাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

৪। তপন শিকদার (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ – ২ জুন, ২০১৪) —শ্রী শিকদার বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ছিলেন দুটি টার্মে, ১৯৯১- ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী ছিলেন। পরে রাসায়নিক ও সার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হন। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে সিপিএমের লালদুর্গ বলে কথিত দমদম লোকসভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি দলের বৃদ্ধিতে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন অসামান্য। সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৫। অধ্যাপক অসীম ঘোষ – ১৯৯৯-২০০২- এই সময়কালে দলের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। তিনি রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ১৯৬৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রাজ্য দলের বুদ্ধিজীবী সেলের সদস্যও ছিলেন একসময়।

৬। শ্রী তথাগত রায়– প্রযুক্তিবিদ শ্রীতথাগত রায় ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কলকাতার মেট্রো রেল স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি Construction Engineering বিভাগে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক। তিনি একজন প্রযুক্তিবিদ, রাজনৈতিক নেতা এবং লেখক । বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর তীব্র অনুভুতি তাঁকে বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে কয়েকটি বাংলা এবং ইংরাজী পুস্তক লিখতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর পূর্বজরাও পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি এই বিষয় নিয়ে ইংরাজিতে My People Uprooted, A Suppressed Chapter in History, Syama Prasad Mookerjee: Life and Times এবং বাংলায় ' যা ছিল আমার দেশ' , বামপন্থা ভয়ঙ্করী, 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ' সহ আরও কয়েকটি পুস্তক প্রণেতা। তিনি হিন্দুত্ব, হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তিনি বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন ২০০২ থেকে ২০০৬ অবধি। এছাড়া তিনি ত্রিপুরা ও মেঘালয় রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন যথাক্রমে ২০১৫ থেকে ২০১৮ এবং ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত । তিনি দলের জাতীয় কার্যনিবাহী সমিতির সদস্য ছিলেন ২০০২ থেকে ২০১৫ অবধি।

৭। শ্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (৮ মে, ১৯৩২—৩ মার্চ, ২০২৩) – জন্ম পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) সিলেটে। সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন ২০০৮-৯ সালে। তিনি কৃষ্ণনগর লোকসভার সদস্য ছিলেন ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ অবধি। কৃষ্ণনগরে খুব জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। তিনি বাজপেয়ী মন্ত্রীসভায় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন (২০০০- ২০০২) । এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন (২০০২—২০০৪) । তিনি ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ছিলেন। ২০২৪ সালে তিনি মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন।

৮। শ্রী বিশ্বজিৎ (রাহুল) সিংহ– সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরে ২০১২ থেকে ২০১৫ অবধি তিনি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিজেপির জাতীয় সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

হিসেবে তিনি ২০১৩ র পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০১৪ তে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনা করেন।

৯। শ্রী দিলীপ ঘোষ – তিনি মেদিনীপুর জেলার কুলিয়ানা গ্রামের মূল বাসিন্দা। বিজেপিতে যোগ দেবার পূর্বে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। আন্দামান ও নিকবোর দ্বীপপুঞ্জে সঙ্ঘ শাখা বিস্তারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। এছাড়া তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কুপ্পহল্লি সীতারামাইয়া সুদর্শনের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। আর এস এস থেকে তিনি বিজেপিতে এসেছিলেন। তাঁকে বিজেপিতে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়। ২০১৫ সালে তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ অবধি তিনি ওই পদে ছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বের সময়ে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রথমবারের জন্য ১৮ লোকসভা আসনে জয়ী হয়। পরবর্তীকালে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে যা বিজেপির ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

১০। ডঃ সুকান্ত মজুমদার – অতি সাম্প্রতিক অতীতে তিনি বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি শিক্ষা দফতর এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে আসীন। তিনি উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট লোকসভা আসনে ২০১৯ এবং ২০২৪ জয়ী হন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মালদহের গৌড়-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় ডক্টরেট করেছেন।

ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

রাজাগোপাল ধর চক্রবর্ত্তী

ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা প্রতিদিন, কেউ কেউ বিশ্বযুদ্ধের ভয় দেখছেন। দুই দেশ ও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কয়েকটা উঠে আসা প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে প্রশ্নের মোড়কে এই প্রবন্ধ।

প্রশ্ন ১ : ইজরায়েলের তুলনায় ইরান কি বিশাল দেশ?

ইজরায়েল মাত্র বাইশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের দেশ আর ইরানেরর আয়তন সাড়ে ষোল লাখ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যায় ইজরায়েল এখনো এক কোটি ছুঁতে পারেনি (সাড়ে সাতানব্বই লাখ) আর ইরানে জনসংখ্যা নয় কোটি ছাড়িয়েছে।

প্রশ্ন ২: ইরানে তো তেলের ভান্ডারে ভরা, ইরানের অর্থনীতি কি ইজরায়েলের থেকে অনেকে এগিয়ে?

ওপেক হিসাব অনুযায়ী ইরানে গচ্ছিত তেলের পরিমাণ কুড়ি হাজার কোটি ব্যারেল, পৃথিবীর তৃতীয়। ভারতেরও আছে ৪৫০ কোটি ব্যারেল, এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইআইএ) তথ্যে বলছে ইজরায়েলের মাত্র এক কোটি ব্যারেল তেল জমা আছে। প্রাকৃতিক গ্যাসে ইরান পৃথিবীর দ্বিতীয়, ভারত ২৩ আর ইজরায়েল ৪৫ স্থানে। তবু ইজরায়েলের জাতীয় আয় বা জিডিপি (বর্তমান) ২০২৩ সালে ছিল ৫১,৪০০ কোটি মার্কিন ডলার, ইরানের ৪০,৫০০ কোটি ডলার জাতীয় আয়ের বেশি। ইজরায়েলের গড় আয় সাড়ে চুয়ান্ন হাজার ডলার, আর ইরানের সাড়ে চার হাজার ডলার। মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) ইরান ১৯৩ দেশের মধ্যে ৭৫ স্থানে আর ইসরাইল ২৭ স্থানে।

মুখোমুখি ইরান-ইজরায়েল।

প্রশ্ন ৩: ইজরায়েল কেন হটাৎ ইরানের সঙ্গে করতে যুদ্ধে নামলো?

ব্যাপারটা হটাৎ নয়। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাস ও ইজরাইল সংঘর্ষ শুরু হবার পর ইরান এবং এর ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সমর্থিত " প্রতিরোধের অক্ষ" এর অংশীদারদের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। এই অক্ষে রয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ, গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে), ইরাকের কিছু মিলিশিয়া বাহিনী এবং ইয়েমেনের হুথি বাহিনী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদ সরকারের পতণের আগে পর্যন্ত, সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী অক্ষের একটি মূল উপাদান ছিল। ইজরাইল ও সৌদি আরবের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় ইরানের এই প্রভাবশালী অক্ষ জোটবদ্ধ। ইজরায়েলি হামলায় হামাস ও হিজবুল্লাহ ধ্বংস প্রায়। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের শাসনের অবসান হয়েছে। হুতিদের ইজরায়েলে হামলা চালানোর সক্ষমতা থাকলেও তাদের

থেকে ইজরায়েলের বড় ঝুঁকির আশঙ্কা নেই। ইরাকি শিয়া মিলিশিয়াদের সম্পদ থাকলেও ইজরায়েলের চিন্তার কারণ নেই এদের থেকে। ২০২৪ সালের অক্টোবরের হামলায় ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নিস্তেজ। শত্রু পক্ষকে আক্রমণের এ এক দারুন সময়। উপরন্তু, ইজরায়েল গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধানে পুনরায় তৎপর। তাই এই যুদ্ধে, ইরানের যাবতীয় পারমাণবিক ঘাঁটি এবং তার সঙ্গে লিপ্ত বৈজ্ঞানিককুল ইজরাইল আক্রমণের নজরে।

প্রশ্ন ৪: ইরানের পারমাণবিক সামর্থ্য কি সত্যি বিনাশ করা সম্ভব?

না, ইরানের পারমাণবিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সারা দেশ জুড়ে। কোনো এক জায়গায় ঝামেলা হলে তা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ইরান তার ইউরেনিয়ম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প ত্যাগ করুক। কিন্তু ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি পরমাণু প্রকল্প নিয়ে নাছোড়বান্দা। ইরানের নাতাঞ্জ পরমাণু স্থাপনায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, আক্রমণে বহু বৈজ্ঞানিক মারাও গেছে। বড় আঘাত এসেছে এসফহন প্লান্টেও। ইরানের আরেকটি বড় পারমাণবিক ঘাঁটি রয়েছে পাহাড়ী এলাকায় গভীর ভূগর্ভস্থ ফোরডো প্লান্টে। এখানে পারমাণবিক জ্বালানী পরিশোধন করার সুবিধা রয়েছে। ইজরায়েল এখানেও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলেও, পরমাণু স্থাপনাটি এখনও পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে।

ইরানের ওপর ইজরায়েলের হামলা শুরুর পর ১৩ জুন এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) বলেছে, নাতাঞ্জ সমৃদ্ধকরণ সাইটটি প্রভাবিত হলেও তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বাড়ে নি। ১৪ ই জুন, আইএইএ বলেছে যে এসফাহান সাইটে জ্বালানী প্লেট ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্টসহ চারটি ভবনে আঘাত হলেও অফসাইট তেজস্ক্রিয়তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইরানের পরমাণু স্থাপনায় ইজরাইলের হামলার জবাবে আইএইএ তাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, 'প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালানো উচিত নয়।

আইএইএ'র সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়েছে যে "শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিবেদিত পারমাণবিক স্থাপনাগুলির উপর যে কোনও সশস্ত্র আক্রমণ এবং হুমকি- জাতিসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং সংস্থার বিধি লঙ্ঘন করে। ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো কেবল শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য নিবেদিত ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়, তবে

তেলের বাজারে উঠছে প্রশ্ন।

নির্বিশেষে, যে কোনও ধরণের পারমাণবিক স্থাপনার বিরুদ্ধে হামলা একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে।

গত ১২ জুন আইএইএ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইরানকে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) বাধ্যবাধকতা মেনে চলার আদেশ দেয়। ইরান সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাইট ঘোষণা করে এবং এনপিটি প্রত্যাহারের হুমকি দেয়।

প্রশ্ন ৬ : যুদ্ধে কি অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে?

ইজরায়েল শত শত এফ-৩৫আই, এফ-১৫আই এবং এফ-১৬ বিমান উড়িয়েছে ইরানের আকাশসীমায় এবং ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, সামরিক নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর বিরুদ্ধে নির্ভুলভাবে জিবিইউ- ২৮ বাঙ্কার বাস্টার, রামপেজ ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেছে। ইরান তার অস্ত্রাগার থেকে শত শত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে পাল্টা জবাব দিয়েছে।

প্রশ্ন ৭: রাশিয়ার ভূমিকা কি?

ইজরায়েল- ইরান সংঘাতে রাশিয়া সম্ভবত সব থেকে খুশি। মার্কিন মনোযোগ এবং সমর্থন ইউক্রেন থেকে ইজরায়েলের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আর তেলের দাম যত বাড়বে তেল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে রাশিয়ার লাভ। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ অনেকটাই উঠে আসবে তেলের দাম বাড়লে।

প্রশ্ন ৮: চিনের ভূমিকা কি?

চিন ইজরায়েলের হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং উভয় পক্ষকে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান করেছে। নিজের জ্বালানি স্বার্থকে বাঁচাতে বেইজিং চাইবে আমেরিকা ইজরায়েলকে নিয়ন্ত্রণ করুক আর ইরানের সঙ্গে কথা বলুক। আমেরিকার ট্যারিফ আঘাতে জর্জরিত চিন চাইবে এই যুদ্ধে আমেরিকার ভুল ত্রুটি তুলে নিজের বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানো।

প্রশ্ন ৯: তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কি আসন্ন?

না। যদি নিঁখুত ভাবে ফরডো আণবিক স্থাপনা ধ্বংস করা সম্ভব হয়, তাহলেই আমেরিকা ইরান আক্রমণ করবে। অবশ্য, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ হলে ওরা ছেড়ে কথা বলবে না। চিন-রাশিয়া, ইরানকে শেষোক্ত কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলবে। রাশিয়া ইউক্রেন নিয়ে বিব্রত, চীন তাইওয়ান নিয়ে। নিজেদের অর্থনীতি নিয়ে সবাই চিন্তিত। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ নামক অনিশ্চিত রোমান্সে কেউ মেতে উঠবে না।

ইরান এখনও যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানতে সক্ষম এমন কোনো ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা বা মোতায়েন করেনি, তবে মহাকাশ উৎক্ষেপণ কর্মসূচির আওতায় দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি অব্যাহত রেখেছে। ইরান হামাস, হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার আল-আসাদ সরকার ও ইরাকের শিয়া মিলিশিয়া মতো অংশীদার / প্রক্সি গ্রুপগুলিকে মিসাইল সরবরাহ করে আসছে। ইরাণের হাতে রয়েছে কিয়াম ১, ফতেহ-১১০, ফতেহ-

৩১৩, টোন্ডার-৬৯ (সিএসএস-৮), শাহাব ১, শাহাব ২, জোলফাগার ও শাহাব-৩ (জেলজাল-৩) মিসাইল আছে। এগুলি সর্বোচ্চ হাজার কিলোমিটার দূর যেতে পারে। কিন্তু ইজরায়েল পর্যন্ত যেতে হোলে লাগবে গদর ১/ মডিফাইড শাহাব-৩, সেজইল ২, খোরামশহর, ইমাড-১ প্রভৃতি মিসাইল। এর সবই কার্যকরী জানা যায় নি, তবে সেজইল ২ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরানের সংগ্রহে দুই থেকে তিন হাজার মিসাইল রয়েছে। ইজরায়েল বলছে, যেসব কারখানায় এগুলো উৎপাদিত হতো সেগুলো ইতমধ্যেই তাদের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইজরায়েল প্রতিরক্ষা সংস্থা, আইডিএফ জানিয়েছে, তারা ইরানের ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণকারী এক তৃতীয়াংশ মিসাইল ধ্বংস করেছে। তা সত্ত্বেও তেহরান এখনও ইজরায়েলে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ছে এবং কিছু ক্ষেপণাস্ত্র অত্যাধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ভেদ করেছে। ইরানের কাছে এখনো অনেক স্বল্পপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

যুদ্ধ কি শেষ নাকি আবারও শুরু হতে পারে? উঠছে প্রশ্ন।

শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পারস্য রাষ্ট্র ইরান এবং সুন্নি আরব পাওয়ার হাউস সৌদি আরবের মধ্যে রেষারেষি বহুজন বিদিত। আরব উপদ্বীপে সৌদি আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই ইরান চরমপন্থী সন্ত্রাসী হুতিদের নিযুক্ত করে। হুতিরাই বলতে গেলে বর্তমান ইয়েমেন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকর্তা। বাব এল-মান্দেব প্রণালী লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত করে, আর এই প্রণালী ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণে। এখান দিয়েই চলে বছরে প্রায় কুড়ি হাজার জাহাজ যা বিশ্বব্যাপী কন্টেইনার ট্র্যাফিকের ত্রিশ শতাংশ এবং বিশ্বের সমুদ্রবাহিত তেলের দশ শতাংশ। ২০২৩ সালে হামাস ইজরায়েল সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকেই হুথি সন্ত্রাসীরা ইজরায়েল এবং লোহিত সাগরের জাহাজগুলিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করে বহু জাহাজ পনবন্দী করেছে। তারা গত ৪ঠা মে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। জবাবে ইজরায়েলি বিমান বাহিনী হুথি শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ইয়েমেনের হোদেইদাহ বন্দর ও বাজিল কংক্রিট প্লান্টে আক্রমণ করে। আইডিএফ জানায় যে তারা হুথি নিয়ন্ত্রিত সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে অক্ষম করে দিয়েছে। হুতিরা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইজরায়েলে প্রায় ৬০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩১০টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে।। ইরান হুতিদের অর্থায়ন করেছে, দিয়েছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, সশস্ত্র মনুষ্যবিহীন আকাশযান (ইউএভি) এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র। এর পাশাপাশি লেবাননে তাদের প্রক্সি হিজবুল্লাহর কর্মীদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হুথির আমেরিকায় বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন (এফটিও) হিসাবে চিহ্নিত। ইরানী সমর্থিত গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল হুথিরাই কিছুটা সক্রিয় এখনও।

উত্তরে ইরান এবং দক্ষিণে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) মধ্যে অবস্থিত হরমুজ প্রণালী। এটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর এবং তারপরে আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করে। বেশিরভাগ উপসাগরীয় দেশ থেকে তেল ও গ্যাস রফতানির জন্য এই জলপথটি একমাত্র সমুদ্রপথ। বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, দৈনিক ১ কোটি ৭০ লাখ ব্যারেলের বেশি যায় হরমুজ প্রণালী দিয়ে। এই প্রণালী বন্ধ করার ক্ষমতা ইরানের আছে। এটা করলে শুধু উৎপাদক আরব দেশগুলি নয়, এশিয়ার বহু দেশ বিপদে পড়বে। ভারতের তার অপরিশোধিত তেলের ৮৫% এরও বেশি আমদানি করে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলে তেলের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে।

যদিও কোনো সন্দেহ নেই ইজরায়েল এই যুদ্ধে অনেক এগিয়ে। তবে তাদের সামরিক অভিযান অনেকাংশে নির্ভর করছে মার্কিন সমর্থনের ওপর। ইজরায়েল আমেরিকার স্বাভাবিক মিত্র। ইরানের ভূগর্ভস্থ পরমাণু কর্মসূচি লক্ষ্য করে ইজরাইল যেসব 'বাঙ্কার বাস্টিং' বোমা ব্যবহার করছে, তার বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের মতে, আরব বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহরাইন, মিশর, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশে কমপক্ষে আটটি স্থায়ী ঘাঁটি এবং অন্যান্য ১৯টি ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়া ওমান, ইরাক ও সিরিয়াতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি রয়েছে। ওই অঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে ফাইটার জেট স্কোয়াড্রন ও অন্যান্য কর্মীসহ অতিরিক্ত সেনা ও রসদ পাঠিয়েছে বলে খবর। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের উপস্থিতি রয়েছে সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও কাতার- এই পাঁচটি আরব দেশের ৩১টি সামরিক ঘাঁটিতে। অন্তত আটটি আরব দেশে ফ্রান্সের স্থায়ী সামরিক স্থাপনা রয়েছে। এ অঞ্চলে পশ্চিমা স্বার্থে আঘাত হানার ব্যাপারে ইরানের ক্ষমতা রয়েছে। ইরান সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো ওই অঞ্চলে পশ্চিমা সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারে। সেটা করলে পরিস্থিতি জটিল হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য সরাসরি যুদ্ধে নামতে পারে।

৫৭ বছর পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেইয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সফরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ত্রিনিদাদের ইতিহাসে প্রথম বিদেশি নেতা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ঘানা-র সংসদে বিশেষ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ।

'অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানা'-ঘানায় সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ঘানা-র রাষ্ট্রপতি ডঃ জন ড্রামণি মহামা।

খুশির জোয়ারে মাতলো রাঢ়বঙ্গবাসী

.....

বর্ধমানে জরাজীর্ণ কৃষক সেতু দিয়ে জীবন হাতে নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করে লক্ষ লক্ষ মানুষ

কৃষক সেতুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং তার পাশেই শিল্প সেতু তৈরীর জন্য **৩০০ কোটি টাকা** **বরাদ্দ করলো মোদী সরকার**

.....

"সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" এটি কোনো স্লোগান নয়, বাস্তবতা

বিজেপি

/BJP4Bengal bjpbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।